

অন্ধকারের গল্প

অভীক সরকার

'অন্ধকারের গল্প' লেখকের নবম বই। যে ছয়খানি গল্প নিয়ে এই ক্ষুদ্র সংকলনটি রচিত, তার প্রায় প্রতিটিই কোনও না কোনও ম্যাগাজিন, ওয়েবজিন অথবা কোনও সংকলনে পূর্বপ্রকাশিত। গল্পগুলি ভয়ের না, ভূতের না, যে আদিম জান্তব বোধ মানুষের মাথার মধ্যে ক্রমাগত অন্ধকারের উর্ণা বুনে চলে, গল্পগুলি সেই বোধের খোঁজ করে চলে। তাই মানুষের মনের কোণে লুকিয়ে থাকা আদিম বিষন্নতা আর অসহায়তা মিশে থাকে প্রতিটি গল্পের পরতে। আসুন পাঠক, সেই অন্ধকারের বহমান নদীতে ডুব দিই।



অভীক সরকারের জন্ম ১৯৭৯-এ, হাওড়ায়। বর্তমান নিবাস কলকাতা। অভীক সরকার পেশায় সেলসম্যান, নেশায় লেখক। লেখালিখির সূত্রপাত ফেসবুকে। প্রকাশিত বই "এবং মার্কেট ভিজিট," "তিতিরপাখি ও প্রিন্সেস," "এবং ইনকুইজিশন," "খোঁড়া ভৈরবীর মাঠ," "পেতবত্থু", " কাউরীবুড়ির মন্দির", "মিত্তিরবাড়ির গুপ্তধন," এবং "চক্রসম্বরের পুঁথি।" পছন্দের বিষয় ইতিহাস, প্রবন্ধ, ধর্মতত্ত্ব, থ্রিলার ইত্যাদি। আর ভালোবাসেন ইস্টবেঙ্গল এবং ইয়ারবন্ধু এবং ইলিশ।

অন্ধকারের গল্প

অভীক সরকার

Choi

Choi publiCation

Andhakarer Golpo
by
Avik Sarkar

প্রথম প্রকাশ: ফেব্রুয়ারি, ২০২২

বইচই পাবলিকেশনের পক্ষ থেকে অংশুমান চক্রবর্তী এবং অভীক সরকার কর্তৃক ৮৭/২১২ রাজা এস সি মল্লিক রোড, কলকাতা: ৭০০০৪৭ থেকে প্রকাশিত এবং লেটারব্রিক্স প্রিন্ট কলকাতা - ৭০০০৯০ থেকে মুদ্রিত।

প্রচ্ছদ - কৃষ্ণেন্দু মণ্ডল
অলংকরণ - সুমন্ত পাল
বর্ণ সংশোধন - কাগজকলম
অক্ষর বিন্যাস - ঋতাক্ষর

দাম - ২০০.০০ টাকা

নিজস্ব বিপণী:
স্টল ১ এবং ২, ব্লক ৩ সূর্য সেন স্ট্রীট, কলেজ স্কোয়্যার, কলিকাতা ৭০০০১২
ফোন: ৯৭৪৭৮৮৮৭৪৭, ৯৮৭৪৩৭৮৫৮৭, ৯৮৩০৪৩০০৪৩
ইমেইল: boichoi.pub@gmail.com
Website: boichoi.com

প্রাপ্তিস্থান:
বইচই বিপণী, দে'জ, দে বুক স্টোর(দীপুদা) এর কলেজ স্ট্রিটের অন্যান্য বিপণী
অনলাইন প্রাপ্তিস্থান:
boichoi.com, Amazon, Flipkart
এবং অন্যান্য অগ্রণী ওয়েবস্টোর

সূচিপত্র

আগুনপাখি



ড্রাগনটাকে প্রথম দেখা যায় শ্যামবাজারের পাঁচমাথার মোড়ে। নেতাজির কাঁধের ওপরে বসেছিল।

ননীগোপাল সাহার হোলসেল দোকানের উলটো দিকে যে বাংলু আর অন্যান্য দেশি মদের ঠেক আছে, তাতে মাঝরাত অবধি বেহুদ্দ বাওয়াল হওয়াটা নিত্যকার ঘটনা। ঠেকটা অবশ্য শিউপ্রসাদের, ঠেকের পেছনেই তার থাকার ঘর। দুপুর থেকে ঠেকের সামনেটা রাজ্যের মুটে, মজুর, কুলিকামিনে ভরতি হয়ে থাকে। রাত বাড়লে এদের সঙ্গে এসে যোগ দেয় দূরপাল্লার ট্রাকের ড্রাইভার, চোর-চিটিংবাজ, রিটায়ার্ড গরিব শিক্ষক, আর যত রাজ্যের মাগির দালাল। জায়গাটা তখন ভিড়ে, গন্ধে, ধোঁয়ায় আর খিস্তিতে নরকগুলজার হয়ে থাকে। যত রাত বাড়ে তত বাড়ে নেশা আর মাতলামি। দোকানের সামনেই তিরতির করে বয়ে যাওয়া খোলা নর্দমার পাশে একটা ব্রিটিশ আমলের বন্ধ্যা জলের কল আছে। বিকেল থেকে রাত দশটা অবধি তারই সামনে একটা ডালা নিয়ে উবু হয়ে ঠায় বসে থাকে মঞ্জুরা বেওয়া। ডালার আগায় জ্বলতে থাকে কেরোসিনের কুপি, তার লকলকে শিখা আর কালো ধোঁয়ার মধ্যে ডালায় শুয়ে থাকে ফুলুরি, চপ, ঠান্ডা ডালবড়া, শুকনো লংকা ভাজা, সিদ্ধ কাবলি মটর আর মুরগির মাথা ভাজা। নেশার মাথায় ডালাকে ডালা উড়ে যায়। লোকজন চাট কেনার অছিলায় মঞ্জুরাকে ঘিরে লুব্ধ চোখে দেখতে থাকে তার থাই আর দাবনা, চোখ দিয়ে চেটে খায় বড়ো বড়ো ডবকা মাই দুটো। খিলখিল কানাঘুষো চলে তার মাইয়ের সাইজ, কতটা টাইট আছে এ নিয়ে। একটা পিনকনের খাম্বা নামিয়ে এ বিষয়ে চাপা গলায় সুচিন্তিত মতামত দেয় হরিসাধন মাস্টার, “বুঝলি বাঁআ, মাগিরা অনেকদিন ঠাপনা খেলে মাল হেবি টাইট থাকে। বিশ্বাস না হলে মওকা দেখে একবার টিপে দেখ না বাঞ্চোৎ।” সেই শুনে কোনো কোনো রসিক নাগর লুঙ্গির

ওপর দিয়ে ল্যাওড়াটা ডলতে থাকতে মঞ্জুরার গা ঘেঁষে বসে রসালাপের উদ্দেশ্যে, আর পরক্ষণেই ছিটকে পড়ে খিস্তি শুনে। এইসব হারামি পাগলাচোদাদের গাঁড়ে গরম শিক ঢুকিয়ে দিলে যে অন্তরের জ্বালা মেটে, থুতু ছেটাতে ছেটাতে সে কথাই বারবার বলতে থাকে মঞ্জুরা বেওয়া। ল্যাম্পপোস্টের আলোয় উড়তে থাকে তার শুকনো চুল, রাগে ভারী বুক দুটো ওঠানামা করতে থাকে, তীক্ষ্ণ কণ্ঠ থেকে বেরিয়ে আসে আরও অশ্রাব্য খিস্তি, থুতু, কফ আর রোজকার জমানো ঘেন্না আর রাগ। ভূলুণ্ঠিত আশিকটিকে দেখে আশেপাশের লোকজন সিটি মেরে হাততালি দেয়, দু-একজন এসে গাঁড়ে কষিয়ে দুটো লাথ মারে।

তারপর শিউপ্রসাদ এসে এইসব বেউড়া পাবলিকের ঘেঁটি ধরে বাকি পয়সা উশুল করে, তারপর কানের গোড়ায় দুটো ঠাটিয়ে বলে, "মাদারচোদ, বহুত তেল হয়েছে দেখছি তোর, চল ফোট লওড়ে, কাল যদি ফির হুজ্জত করবি তো..."

তারপর বমি, পেচ্ছাপ আর ফেলে যাওয়া শিশি বোতল পেরিয়ে গভীর রাতে মঞ্জুরা বেওয়া বন্ধ হয়ে যাওয়া দোকানের ভেতরে যায় হাত-পা ধুয়ে পরিষ্কার হতে। অনেকক্ষণ ধরে পেচ্ছাপ করে, অনেকটা জল প্রায় সারা গায়ে ছেটায়, গার্গল করে আওয়াজ তুলে, গরম হয়ে যাওয়া কানের লতিতে জল ছোঁয়ায়। তারপর শাড়িটা খুলে কলতলায় ধুতে ধুতে খুঁখুঁ করে কাঁদতে থাকে, এসব নাপাক গুনাহ্ করার জন্যে আল্লার কাছে মাফি চায়। এবং তারপরে শাড়িটা বাইরে দড়িতে টাঙিয়ে দিয়ে শিউপ্রসাদের ঘরে এসে শায়া-ব্লাউজ খুলে, কুঁচকি চুলকোতে চুলকোতে বিছানায় শুয়ে পড়ে, দোকানের সামনের বসবার ভাড়া মেটাবার জন্যে।

রোজকার ভাড়া রোজ।

ততক্ষণে শিউপ্রসাদও দোকান বন্ধ করে, তার সামনে

খবরের কাগজ জ্বালিয়ে আরতি করে ঘরে আসে, পাজামা আর ফতুয়া খুলে টাঙিয়ে রাখে আলনায়। তারপর প্রায় ঝাঁপিয়েই পড়ে মধ্যবয়সী শরীরটা নিংড়ে নেবে বলে। খানিকক্ষণের লদকালদকির পরে থুতু হাতে নিয়ে আন্দাজে মঞ্জুরার যোনিদেশে ঘষে, লাথি মেরে পা-দুটো দু-দিকে সরায়, আর মাতাল উগ্র ঝাঁজে নিজের দীর্ঘ লিঙ্গটি সেই শিথিল, বহুপ্রজ এবং সামান্য পিচ্ছিল যোনিপথে গ্রথিত করে দেয়।

শিউপ্রসাদের স্পষ্ট মনে আছে যে, সেদিন ভোরবেলা মঞ্জুরা বেরিয়ে গেলে প্রথমে সে কলতলায় গোসল করে, তারপর ঘরে শিউজির ফোটোর সামনে নৈমিত্তিক প্রণাম নিবেদন শেষে কাচা পাজামা আর ফতুয়া পরে দোকানের জন্যে কিছু সামান কিনতে বেরিয়েছিল। সকালটা ছিল সাফসুতরা আর খুবসুরত।

রাস্তায় হাঁটতে হাঁটতে বিড়বিড় করছিল শিউপ্রসাদ, বহোত পাপ মহাদেও, বহোত বড়া পাপ। দেশের বাড়িতে বিবি বাচ্চাদেরকে রেখে দিয়ে এখানে একা একা থেকে এইসব কারোবার... তার ওপর এই বেগানা অওরতটার সঙ্গে রোজ এসব... ঠিক নয়, বিলকুল ঠিক নয়। খুব সম্ভবত শিউজির কাছে মাফি মাংবার জন্যেই সে মাথা তুলে তাকিয়েছিল আকাশের দিকে আর ঠিক তক্ষুনি সে ড্রাগনটাকে দেখতে পায়।

প্রথমে শিউপ্রসাদ ভেবেছিল বহুত বড়া চমগাদড়, অর্থাৎ বাদুড় হবে বোধহয়। পরক্ষণেই প্রাণীটার গলা, মুখ আর ডানার বিস্তার দেখে সে হাঁ হয়ে রাস্তায় দাঁড়িয়ে পড়ে।

ততক্ষণে মোড়ের গুমটির নীচে শুয়ে থাকা দু-একটা ভিখিরিও উঠে পড়েছে। তারাও পিচুটি ভরা চোখগুলো খুলে হাঁ করে এই লতুন চিড়িয়া দেখতে তাকিয়ে থাকে ওপরে। কিন্তু তাদের এই বিস্ময় বেশিক্ষণ স্থায়ী হয় না, হইহই করতে করতে পরমুহূর্তেই এসে পড়ে দিনের প্রথম দুশো সাতাশ,

আর তার পেছন পেছন একটা ফাঁকা সাতচল্লিশের-বি। দুটো বাসই সবেগে আসতে আসতে রাস্তার প্রায় মাঝখানে দাঁড়িয়ে থাকা শিউপ্রসাদের পেছনে এসে ক্যাঁ-এ-এ-চ করে দাঁড়িয়ে যায়। গরগর করতে থাকা দুটো বাস থেকেই গত রাতের খোঁয়ারি না-কাটা কনডাক্টর আর হেল্পাররা খিস্তি দিতে দিতে নেমে আসে, এই গাণ্ডু চুতিয়াটির গাঁড়ে লাথ মেরে সরিয়ে দেওয়ার জন্যে, আর তারপরেই বেশ কয়েক জোড়া চোখ নেতাজি মূর্তির মাথার দিকে চেয়ে স্থির হয়ে যায়।

আর তারপরেই যেন এই পুরো পরিবেশকে এক গম্ভীর ব্যঞ্জনা দিতেই আসে দিনের প্রথম ট্রাম, শ্যামবাজারের ট্রাম গুমটি থেকে। রাস্তার মাঝখানে কয়েকটা উজবুক ওপরে মাথা তুলে কী দেখছে জানার জন্যে প্রবীণ সরকারি কর্মচারী ট্রামচালকটি ট্রাম বন্ধ করেন, তারপর তুড়ি দিয়ে হাই তুলতে তুলতে নেমে আসেন, অলস চোখে ওপরে তাকান, তারপর সেই বিশাল পক্ষীরাজকে দেখে বিরস বদনে 'হেইইও হপ হপ' করতে করতে একটা আধলা ইট ছুড়ে দেন।

জবাবে সেই খগরাজ এক তীক্ষ্ণ ঘষা আর্তনাদে সমস্ত উত্তর কলকাতার গলিখুঁজি সচকিত করে তোলে, সঙ্গে ছুড়ে দেয় বিশাল গোলার আকারের আগুনে থুতু। মুহূর্তে পুড়ে যায় সেই শ্লথ গিরগিটির মতন অতিকায় প্রাচীন ট্রাম, আর্তনাদ করে জ্বলতে থাকে তার বেওকুফ প্রৌঢ় চালক। ড্র্যাগনের মুখ থেকে বেরিয়ে আসা আগুন স্রোতে মুহূর্তে জ্বলে ছাই হয়ে যায় শ্যামবাজারের আকাশ জুড়ে থাকা যাবতীয় ট্রামলাইন, ইলেকট্রিকের তার, বেআইনি হুকিং, ফুটপাথ দখল করে থাকা চট জড়ানো কাঠের গুমটি আর বিভিন্ন দাবিদাওয়া সম্বলিত ফ্লেক্স ব্যানার। জ্বলতে থাকে বিভিন্ন দোকানের সামনে ডাঁই করে রাখা ছেঁড়া কাগজ আর নোংরার স্তূপ। জ্বলন্ত কয়লার সাইজের আগুনের ফুলকি উড়ে এসে আছড়ে পড়ে

শিউপ্রসাদের আশেপাশে। জ্বলতে থাকা সেই ট্রামচালকটি যেন কোনো সিনেমার অলৌকিক দৃশ্যের মতন দৌড়াদৌড়ি করতে থাকেন চারিদিকে, তারপর নেতাজি মূর্তির সামনের রেলিঙে ঠ্যাং ভেঙে পড়ে যান। বাঁশ ফাটার মতো শব্দ করে ফাটতে থাকে তাঁর হাড় ও খুলি। শুকনো বুড়ো লোকটা একটা বিচ্ছিরি অভদ্র লোকচিত ভঙ্গিতে মরে পড়ে থাকে।

এতটা দেখার পর শিউপ্রসাদ খেয়াল করে যে সে পেচ্ছাপ করে ফেলেছে এবং ভিজে পাজামার মধ্যে থরথর করে কাঁপছে তার সবল হাঁটু দুটো। এবং সবিস্ময়ে সে এও আবিষ্কার করে যে সে মুখ বন্ধ করতে পারছে না, মুখ থেকে প্যারালিসিস আক্রান্ত রোগীর মতন অবিরত গড়িয়ে পড়ছে থুতু ও নাল।

আর ঠিক তক্ষুনি সেই বিশাল ড্রাগন ডানা বিস্তার করে নেমে আসে নীচে, ঠিক শিউপ্রসাদের সামনে। ঠকঠক করে কাঁপতে কাঁপতে ঘামে ভেজা পইতেটা জড়িয়ে ধরে শিউপ্রসাদ, আর দাঁতে জিভে জড়িয়ে 'রামচরিতমানস' আওড়াতে থাকে। আর তারপর একবার চোখ তুলে চাইতেই...

দুটো উজ্জ্বল হলদে চোখ দিয়ে দানোটা ওর দিকেই চেয়ে আছে। চোখের চারিদিকে লাল আভা, আর একটা ক্লান্ত ও শান্ত ধারালো চাউনি, নিষ্ঠুর এবং খুনে চাউনি।

গরুড়, ইনি পাক্কা গরুড়জি না হয়ে যান না।

'রামচরিতমানস' আবৃত্তি করার সঙ্গে সঙ্গে প্রতিবর্তী ক্রিয়ায় বোধহয় মাথাও নাড়াচ্ছিল শিউপ্রসাদ। ড্রাগনটা বেশ কিছুক্ষণ ওর মাথা দোলানিতে আনন্দ পায় এবং ওর তালে নিজের ঘাড় দোলাতে থাকে, তারপর বিরক্ত হয়ে ফের উড়ে গিয়ে নেতাজির ঘোড়ার ওপর গিয়ে বসে।

এর আধঘণ্টার মধ্যে সারা কলকাতা ভেঙে পড়ে শ্যামবাজারের মোড়ে। বিদ্যুতের মতন ছড়িয়ে যায় সেই খবর,

আর আপামর বাঙালি পিলপিল করতে করতে বেরিয়ে পড়ে ড্রাগন দেখতে। আশেপাশের বিভিন্ন বিপজ্জনক বাড়ির ওপর থেকে আরও বিপজ্জনক ভাবে ঝুলতে থাকে সমগ্র হুজ্জত-এ-বঙ্গাল। তিলধারণের জায়গা থাকে না স্টার থিয়েটার থেকে ডানলপের মোড় অবধি, মণীন্দ্র কলেজ থেকে তেঁতুল তলা অবধি লোকে লোকারণ্য হয়ে যায়। শাসক দলের ছেলেরা এরই মধ্যে সুশৃঙ্খল ভাবে লাইন মেইনটেইন করতে নেমে পড়ে। লাইনে সুসংবদ্ধ শান্ত স্থৈর্যের সঙ্গে দাঁড়িয়ে পড়েন নাতির হাত ধরে দাদু, কোলের ছেলের মুখে মাই গুঁজে পাড়ার সবজিওয়ালি, আধুনিকতম মোবাইল হাতে স্পাইক চুলো যুবকটি, এবং সদ্যস্নাতা, হাতের ঝুড়িতে বেলপাতা, আকন্দ ফুল, কাঁচা দুধের ঘটিসহ কিছু প্রাচীনা বৃদ্ধাও।

বলাবাহুল্য, এর কিয়ৎক্ষণ পরে সমস্ত টিভি চ্যানেল তাদের ওবি ভ্যান নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ে এই যুদ্ধক্ষেত্রে। টিভিতে প্রাজ্ঞ পণ্ডিতেরা সরকারের সামগ্রিক শাসনব্যবস্থার মুণ্ডপাত করতে থাকেন। ব্রেকফাস্টের টেবিলে বসে সেই আলোচনা দেখে ফেসবুকে উত্তেজনার আগুনে ঢেউ বয়ে দেন শহরবাসী। দিল্লি, মুম্বাই, ব্যাঙ্গালোর, লন্ডন, নিউইয়র্ক সব জায়গা থেকে আসা ফোনে সচকিত হয়ে ওঠে পুরোনো কলকাতার পুরোনো বুড়োবুড়ি ভরতি পুরোনো বাড়িগুলো। হোয়াটসঅ্যাপে মুহুর্মুহু আছড়ে পড়ে 'কলকাতায় ড্রাগন' সম্পর্কিত হাজারটা জোক্স। শুধু একটা পোড়া ট্রাম আর পুড়ে কাঠ হয়ে যাওয়া একটা মৃতদেহের ক্লান্ত দৃশ্য বারবার ফিরে আসে টিভির পর্দায়।

শিউপ্রসাদ কিন্তু ততক্ষণে প্রথম প্রত্যক্ষদর্শী হিসেবে হিরো হিসেবে বেজায় সম্মান পাচ্ছে। তার বন্ধ ঠেকটির সামনে একটা বেঞ্চির ওপরে বসে আছে সে, মুখে সামান্য বিভ্রান্ত লাজুক হাসি। পেচ্ছাপে ভেজা পাজামা গায়েই শুকিয়েছে তার। চারিদিক থেকে সাংবাদিকরা ছেঁকে ধরেছে তাকে, "কখন

দেখলেন?" "আপ ক্যায়া কর রহে থে", "ড্রাগন বলে চিনতে পেরেছিলেন?" "আপ পেহলে কভি ড্রাগন দেখে হ্যায়?" "আপনার কি মনে হয় এর পেছনে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের হাত আছে?"

হিন্দি-বাংলা মিশিয়ে নিজের অভিজ্ঞতা বলতে বলতে হালকা আত্মশ্লাঘা অনুভব করছিল শিউপ্রসাদ। এসব খবর ওয়গেরাহ এতক্ষণে নওয়াদা পৌঁছে গেছে, না? শিউজির মন্দিরের পাশে বরগত পেড়ের নীচে পঞ্চায়েত তো পাক্কা বসেই গেছে। এসব ভাবতে ভাবতেই একটা চেনা গন্ধ পায় শিউপ্রসাদ। পাশেই জান পেহেচান কেউ দাঁড়িয়ে আছে নাকি? কথা বলতে বলতেই আড়চোখে তাকায় শিউপ্রসাদ, শাড়ির আঁচলটা চিনতে ওর বিন্দুমাত্র অসুবিধা হয় না।

প্রত্যাশা মতোই দুপুর নাগাদ আর্মি নেমে পড়ে অ্যাকশনে এবং এসেই নিপুণ হাতে সমস্ত পরিস্থিতির কন্ট্রোল নিয়ে নেয়। আগেই লাঠি মেরে ভিড় সাফা করে ফেলে তারা। তারপর পুরো এলাকাটা আঁটোসাঁটো করে কর্ডন করে ফেলে, এলএমজি এবং লাইট আর্টিলারিসহ এক প্ল্যাটুন নাগাসেনা মজুত হয়, সঙ্গে দমদমের বিভিন্ন মাঠে একটা করে কমব্যাট হেলিকপ্টার স্ট্যান্ডবাই করে রাখা। এলাকাবাসী সমঝে যায়, হুঁহুঁ, আর্মির সঙ্গে গাঁড় পিঁয়াজি নয় বাওয়া, নাগাসৈন্য দেখে শালা পাড়ার কুত্তাগুলো অবধি কোথায় লুকিয়েচে দেকেচ?

ততক্ষণে শুধু ভারত নয়, পৃথিবীজোড়া লক্ষ কোটি নজর শ্যামবাজারের ওপর। বস্টন থেকে বেইজিং, মরিশাস থেকে মিউনিখ, রিয়াধ থেকে রিও ডি জিনেইরো সর্বত্র আজ থরথর উত্তেজনা। এই প্রথম একবিংশ শতাব্দীর চোখে, পরি নয়, ইউনিকর্ন নয়, শেষনাগ নয়, পক্ষীরাজ নয়, মৎস্যকন্যা নয়... চিন থেকে ইউরোপ অবধি কোটি লোকের বিভিন্ন কল্পকথায়

যার অবাধ বিচরণ, সেই ড্রাগন! এইমুহূর্তে লক্ষ কোটি চোখ টিভির পর্দায় চোখ সেঁটে আছে এই অষ্টম আশ্চর্যটিকে দেখার জন্যে। তার প্রতিটি নড়াচড়া এই মুহূর্তে লক্ষ করছে কয়েক হাজার ক্যামেরা। আশেপাশের সমস্ত বাড়ির ছাদ ও জানালা এখন বিবিসি, সিএনএন আদি বিভিন্ন বহুজাতিক মিডিয়া কোম্পানির অধিকারে। রাষ্ট্রপুঞ্জের বিশেষ অধিবেশন ডাকা হয়েছে। ওদিকে সন্ধে নাগাদ টিভিতে জাতির উদ্দেশ্যে ভাষণ দিতে শুরু করেন প্রধানমন্ত্রী।

ঠেকের পিছনে নিজের ঘরে বসে মঞ্জুরা বেওয়ার আনা চারটে রোটি, পিঁয়াজ দিয়ে ভাজা কুঁদরি আর আন্ডা কারি দিয়ে গোগ্রাসে খাচ্ছিল শিউপ্রসাদ। আজ স্বাভাবিকভাবেই ঠেক বন্ধ, সারা এলাকাতে একশো চুয়াল্লিশ ধারা। তবুও ফুরফুরে মনে স্প্রাইট, লেবু আর কাঁচা লংকা দিয়ে একাই একটা বাংলুর খাম্বা পেঁদিয়েছে সে, ভাগ্যিস মঞ্জুরা মনে করে কয়েকটা ডালবড়াও এনেছিল। সে নিজেও অবশ্য একটা পাইট নামাতে ছাড়েনি। তারপর নেশাটি তর হওয়াতে দুজনেই খেতে বসে।

খেতে খেতে আড়চোখে মঞ্জুরার মাই দুটোর দিকে তাকায় শিউপ্রসাদ, আজকে ভেতরের জামা পরেনি নাকি শালি? খুব ঢলানি বেড়েছে ছেনালটার। এতগুলো লোকের সামনে...

তারপর নিরাসক্ত সুরে শুধোয়, "এইসব খানা বানিয়ে কে আনতে বলেছিল তোকে? খুব জরুরত তো ছিল না।"

খেতে খেতে একটানা নৈর্ব্যক্তিক স্বরে মঞ্জুরা বলে যে আজ তো পুরো এলাকা বন্ধ। আর শিউপ্রসাদ তো হোটেল থেকে খাবার আনিয়ে খায়। সে ভাবল লোকটার খাওয়া জুটবে না, তাই...

নৌটঙ্কি শালা, আঁচাতে আঁচাতে ভাবে শিউপ্রসাদ। মাসের পাঁচদিন তাকে ভাড়াটা টাকায় নিতে হয়। সেসব মেরে দেওয়ার ফিকির নয় তো শালির?

এসে দেখে মঞ্জুরা অভ্যেস মতন ব্লাউজ আর শায়া খুলে শুয়ে আছে। পাজামা আর ফতুয়া খোলে শিউপ্রসাদ, দড়িতে টাঙায়। তারপর বিছানায় উঠে অভ্যেস বশত মঞ্জুরার মাইয়ের বোঁটা দুটো নিয়ে খেলতে থাকে, আর জিজ্ঞেস করে, "আজ তো দুকান বনধ ছিল। তুকে তো বসতে হয়নি। কীসের কিরায়া দিচ্ছিস রে?"

"শুধু কিরায়ার জন্যে শুতে আসি, কে বলল তোমাকে?"

শিউপ্রসাদের সব একটু ধাঁধা লেগে যায়। তাহলে শালি কী করতে আসে বে?

"আজ ভিতরির জামাটা পরিসনি? বেশরম অওরত, অত লোকের সামনে চুচি দুটো দিখাতে বহুত ভালোলাগে, না?"

সেই নিঃস্পৃহ নিরাসক্ত সুরে জবাব দেয় মঞ্জুরা, "পরেই এসেছিলাম। এসে খুলে রেখেছি।" কেন বলতে পারবে না শিউপ্রসাদ, জবাব শুনে একটু হালকাই লাগে বুকের ভেতর। ফলে আজ সেই চির চেনা পুরোনো ভূমি কর্ষণ করার সময় শুধু অভ্যেস নয়, কিছু আদরও পেয়ে বসে তাকে।

পরের দিন ঘুম থেকে উঠতে একটু দেরিই হয় শিউপ্রসাদের, মঞ্জুরা তখনও পাশে শুয়ে। উঠেই শুনতে পায় দুমদুম করে দরজা ধাক্কাচ্ছে কে। দ্রুত উঠে পাজামা আর ফতুয়া পরে নেয় শিউপ্রসাদ, গিয়ে দরজা খোলে। দেখে দুটো নাক চ্যাপ্টা আর্মির লোক দরজা ধাক্কাচ্ছিল, পাথর কোঁদা শরীর, ভাবলেশহীন চোখমুখ।

"কমান্ডান্ট বুলা রহেঁ হ্যাঁয়, চলো।"

বিস্মিত হয়ে যায় শিউপ্রসাদ, "কিঁউ? হামনে কেয়া কিয়ে?"

"পাতা নেহি। অর্ডার হ্যায়। চলো।"

"আরে, লেকিন কিঁউ ভাই? ওজায়হ তো বাতাও।"

আর্মির লোক আদেশ বোঝে, প্রতিবাদ বোঝে না। ঝট

করে একজন ঘাড় চেপে ধরে, সংক্ষিপ্ত আদেশ, "চলো"।

দরজা ধরে দাঁড়িয়ে ছটফট করতে থাকে শিউপ্রসাদ, "আরে হামনে ক্যা কিয়ে ভাই, হামরা ক্যা কসুর?"

পেছন থেকে আলুথালু বিস্রস্ত বেশে ছুটে আসে মঞ্জুরা, এসেই শিউপ্রসাদের হাত ধরে থাকা নাগা সোলজারটির হাত ধরে টানাটানি করতে থাকে, "সক্কালবেলা লোকটাকে নিয়ে কোথায় যাচ্ছিস বে চুতমারানিরা, ছেড়ে দে, ছেড়ে দে বলছি", বলতে বলতে হিংস্র অন্ধ রাগে কামড় বসায় সেই হাতে।

মুহূর্তের জন্যে শিউরে উঠে হাতের মুঠি আলগা করে সেই সৈন্যটি, তারপরেই এক বিরাশি সিক্কার থাপ্পড় আছড়ে পরে মঞ্জুরার গালে। ঠক করে উঠোনের ওপর পড়ে যায় মঞ্জুরা, কষ বেয়ে ক্ষীণ রক্তস্রোত নেমে আসে।

ভয়ে কাঁপতে থাকা শিউপ্রসাদকে নিয়ে ডানলপের দিকে দ্রুত ঘুরে যায় মিলিটারি জিপ।

ডানলপ পুলিশ স্টেশনের একতলাটা খালি করে আর্মির স্পেশাল ইউনিট অফিস বসানো হয়েছে। সেখানে বসেই টিভি দেখতে দেখতে ভ্রূ কুঁচকে ভাবছিলেন মেজর সঞ্জীব ব্রার। চব্বিশ ঘণ্টা কেটে গেছে, কিন্তু ড্র্যাগনের নড়াচড়ায় বিশেষ কোনো পরিবর্তন হয়নি। নেতাজি মূর্তির আশেপাশেই সে ঘুরঘুর করছে। কখনও নীচে নেমে আসে, ডানা গুটিয়ে কী যেন ভাবতে থাকে। তারপর এদিক-ওদিক দু-পা হেঁটে ফের মূর্তির ঘাড়ে চড়ে বসে। মাঝে মাঝে আকাশের দিকে মুখ করে অত্যন্ত তীক্ষ্ণ আওয়াজ করে চেঁচিয়ে কাকে যেন ডাকে। উত্তর কলকাতার নিশ্বাস বন্ধ করে রাখা পড়ন্ত দুপুরে ছড়িয়ে পড়ে সেই বিষণ্ণ কান্নার মতন আওয়াজ।

আর কর্ডনের ওপারে দাঁতে দাঁত চেপে অস্ত্র হাতে অপেক্ষা করতে থাকে এক প্ল্যাটুন সৈন্য, তাদের সঙ্গে যোগ দিয়েছে ইন্ডিয়ান আর্মির স্পেশাল অপারেশনস গ্রুপ মার্কোসের

একটা বারো জনের ছোটো ইউনিট। সবার ওপর কড়া নির্দেশ, একদম চূড়ান্ত আউট অফ কন্ট্রোল সিচুয়েশন ছাড়া একরাউন্ড গুলিও যেন ফায়ার করা না হয়। যে-কোনো মূল্যে এই প্রাণীটিকে বাঁচিয়ে রাখতে হবে। তা ছাড়া অত্যন্ত ঘনবসতিপূর্ণ এলাকা, সামান্য প্রভোকেশনেই দক্ষযজ্ঞ বেধে যেতে পারে, তাতে বিপুল প্রাণহানি অনিবার্য।

সারা পৃথিবী জুড়ে চূড়ান্ত উত্তেজনা। বিভিন্ন দেশের রাষ্ট্রপ্রধানরা বারবার পরিস্থিতির খোঁজ নিচ্ছেন। খবরের কাগজে ড্রাগন ছাড়া আর কোনো খবরই নেই। সারা পৃথিবীর পক্ষী বিশেষজ্ঞরা চুল ছিঁড়ছেন ড্র্যাগনের খাবার, অভ্যেস ইত্যাদি কী হতে পারে তাই নিয়ে। আনন্দবাজারের বক্তব্য, সত্যজিতের কল্পনা মতন কোনো ডুংলুংডো হয়তো সত্যিই আছে, বা কোনো প্যারালাল ইউনিভার্স। এই ড্রাগন হয়তো সেখান থেকে কোনো ভাবে ছিটকে পড়েছে এই দুনিয়াতে। বিখ্যাত কবি 'ড্র্যাগনের শিরদাঁড়া' নামে একটি কবিতা লিখে ফেলেন ফেসবুকে, সে লেখা মুহূর্তে ভাইরাল। বহুল পঠিত শিশু সাহিত্যিক ঘোষণা করেন পরের পূজাবার্ষিকীতে তাঁর প্রকাশিতব্য উপন্যাসের নাম, 'একলা ড্রাগন আর বুরুন'।

তবে সবকিছু ছাপিয়ে সবার মনে একই জিজ্ঞাসা, ড্রাগনটা এল কোথা থেকে? কী চায়? কী কী করতে পারে? ও কি কাউকে বা কিছু খুঁজছে? ওকে কি ধরা হবে? বা আদৌ ধরা যাবে?

আর সবচেয়ে বড়ো প্রশ্ন, যদি ধরা যায়, এর মালিকানা কার হবে!

ভ্রূ কুঁচকে অন্য কথা ভাবছিলেন মেজর ব্রার। তাঁর কাছে অত্যন্ত উচ্চমহল থেকে অর্ডার এসেছে যে নেক্সট আট ঘণ্টা যে করে হোক ড্রাগনটাকে যেন কন্টেইন করে রাখা হয়, আর তার খাবারদাবারের ব্যবস্থা করা হয়। সিঙ্গাপুর থেকে

টাংস্টেনের অ্যালয় দিয়ে তৈরি বিশেষ খাঁচা আসছে, সঙ্গে একদল ট্রেইনড হান্টার, পশুপাখি জীবন্ত ধরায় যাদের দক্ষতা প্রশ্নাতীত।

পাক্কা খবর আছে মেজর ব্রারের কাছে, এই ড্রাগনটাকে ধরে চায়নার হাতে তুলে দেবে ইন্ডিয়ান গভর্নমেন্ট। সেইমতোই কথা হয়েছে দুই দেশের প্রিমিয়ারের মধ্যে। ড্রাগন চাইনিজদের কাছে ঈশ্বরতুল্য প্রাণী। বদলে ইন্ডিয়া পাবে নিরাপত্তা পরিষদের স্থায়ী সদস্য হওয়ার পথে চিনের বাধা হয়ে না দাঁড়ানোর আশ্বাস।

এখন কথা হচ্ছে ড্রাগনটাকে খাওয়াতে যাবে কে? এসব কাজ সাধারণত কোনো চিড়িয়াখানার ট্রেইনড কর্মচারীদের করার কথা, কিন্তু আলিপুর জু-এর লোকজন শুনেই বেঁকে বসেছে। মেজর ব্রার জানেন যে ওয়েস্ট বেঙ্গল খুবই ধর্মঘটপ্রবণ এলাকা, ফলে জোরাজুরি করারও কোনো চান্স নেই। আর এরকম একটা ফালতু ব্যাপারে আর্মির লোকেদের লাইফের রিস্ক নেওয়ার প্রশ্নই ওঠে না। একটা উপায় অবশ্য ভেবেছিলেন মেজর ব্রার, এখনও অবধি ড্র্যাগনের সবচেয়ে কাছাকাছি যেতে পেরেছে যে লোকটা...

ভাবতে ভাবতেই দরজা খুলে যায় রুমের, বুটে বুট ঠুকে স্যালুট ঠুকে রিপোর্ট করে দুই নাগা জওয়ান, দুজনেই হাত দিয়ে শক্ত করে ধরে আছে শিউপ্রসাদকে, বলির পাঁঠার মতন ঠকঠক করে কাঁপছে সে।

মধুর হাসিতে ভুবন ভরিয়ে শিউপ্রসাদকে আপ্যায়ন করেন মেজর ব্রার, "আইয়ে শিউপ্রসাদজি। সুবাহ সুবাহ থোড়া তকলিফ দেনা পড়া..."

****

একটু আলগা হয় ঘননিবদ্ধ কর্ডন, হাতে একটা বালতি নিয়ে কর্ডনের ভেতরে আসে যে লোকটা, দেখে মনে হয় কয়েক ঘণ্টাতেই তার বয়স বেড়ে গেছে অনেক। ধীরে ধীরে চপ্পল পরা পা-দুটো টেনে টেনে সে এগিয়ে যায় নেতাজি মূর্তির দিকে। চোয়াল শক্ত করে ট্রিগারে হাত রেখে অপেক্ষা করে এক প্ল্যাটুন সৈন্য। বারো জন কমব্যাট রেডি মার্কোস দাড়ি চুলকোতে চুলকোতে ভাবলেশহীন চোখে দৃশ্যটা দেখে, যদিও শরীরের প্রতিটি পেশি আর নার্ভ অপেক্ষারত, নির্দেশ পেলেই ঝাঁপিয়ে পড়তে এক সেকেন্ডও সময় নেবে না। আশেপাশের সমস্ত ছাদ আর জানলা থেকে বুম ক্যামেরা রেডি, তাদের অপারেটরদেরও আঙুল ঘামতে আরম্ভ করে, ধীর হয়ে আসে নিশ্বাস।

ড্রাগনটা প্রথমে শিউপ্রসাদকে দেখেনি। একবার একটা লেজের মোচড়ে নেতাজির ঘাড় ঘুরে বুকের দিকে আসতেই নজর পড়ে, আর ঠিক তক্ষুনি বিশাল ডানা বিস্তার করে নেমে আসে তার সামনে।

শিউপ্রসাদ আবিষ্কার করে যে অনিচ্ছাতেই ফের তার হাত দুটো থরথর করে কাঁপছে, হাঁটু দুটো মনে হচ্ছে এক্ষুনি ভেঙে পড়বে। খানিকটা হেঁটে থামে সে, তারপর মাথা তুলে তাকায়, আর দেখে যে গরুড়জি ফের কালকের মতোই ওর দিকে তাকিয়ে আছেন, সেই লালচে-হলুদ খুনে দৃষ্টি।

থরথর করে কাঁপতে কাঁপতে 'রামচরিতমানস' আওড়াতে থাকে শিউপ্রসাদ, আর ধীরে ধীরে ডান হাতটা বালতির মধ্যে ঢোকায়।

একটা তীক্ষ্ণ শিসের মতন আওয়াজের সঙ্গে শিউপ্রসাদ দেখে যে ড্র্যাগনের পিঠ ধনুকের মতন বেঁকে উঠেছে ক্রোধে, দুনো ফুলে উঠেছে সারা দেহ, ঘাড়টা নীচু, আর গলার কাছটায় খেলা করছে আগুনে রক্তের স্রোত। চোখ দুটো দপ করে যেন

জ্বলে উঠে রক্তবর্ণ হয়ে গেল, আস্তে আস্তে মুখটা হাঁ হচ্ছে আর শিউপ্রসাদ স্পষ্ট দেখছে যে গলা থেকে টাগরার দিকে উঠে আসছে লাল লাভার স্রোত...

ডান হাত দিয়ে বালতির ভেতর থেকে একটা জবাই করা মুরগি বের করে শিউপ্রসাদ, তুলে ধরে ড্র্যাগনের চোখের সামনে।

তারপর কয়েকটি শ্বাসরুদ্ধকর মুহূর্ত।

একটু কি থমকে গেল সেই আগুনে প্রাণীটি? আস্তে আস্তে স্বাভাবিক হয়ে আসে তার শরীর। ডানা গুটিয়ে আনে শরীরের পাশে। ফিরে আসে তার স্বাভাবিক হলুদ চোখ। সেই চোখে কি কিছু বুভুক্ষাও দেখে শিউপ্রসাদ? নইলে যতটা শক্তি গায়ে ছিল সব একত্র করে কেন সে ড্র্যাগনের দিকে ছুড়ে দেবে সেই মৃত মুরগির শরীর?

খানিকক্ষণ ধরে পালাক্রমে শিউপ্রসাদ আর পালক ছাড়ানো মুণ্ডহীন মুরগির দিকে তাকাতে থাকে সেই বৃহদাকার পক্ষীসম্রাট। তারপর ধীরে ধীরে, লম্বা সাপের মতন কাটা জিভ বার করে মুরগিটাকে মুখের মধ্যে টেনে নেয় সে।

স্থির দাঁড়িয়ে থাকে শিউপ্রসাদ, আর-একটা মুরগি শূন্যে ছুড়ে দেয় সে, খেলার ভঙ্গিতে তাকে মুখে পোরে সেই ড্রাগন। তারপর আর-একটা। এবং আর-একটা।

মনিটর থেকে চোখ সরিয়ে কাঁপা কাঁপা হাতে কপালের ঘাম মোছেন মেজর ব্রার, "দ্যাট বাগার ডিড ইট। ফাক ম্যান, মেরি তো গান্ড লাগ গ্যয়ি থি..."

এরপরে আরও ধীরে শিউপ্রসাদের কাছে এগিয়ে আসে সেই বিশালকায় খগরাজ। মাথা নামিয়ে আনে শিউপ্রসাদের মুখের কাছাকাছি। নিশ্চল ও স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে শিউপ্রসাদ। ড্রাগনটা তার মুখ নামিয়ে আনে আরও নীচে। শিউপ্রসাদের মুখের একদম কাছাকাছি।

ধীরে, অতি ধীরে, যেন এক প্রাগৈতিহাসিক নাটকের অন্তিম বিয়োগান্ত দৃশ্যের মতন, ড্র্যাগনের মুখ ছোঁয় শিউপ্রসাদের মুখ।

কাঁচা রক্ত মেশানো এক অলৌকিক জান্তব ঘ্রাণের সঙ্গে কিছু উত্তাপও অনুভব করে শিউপ্রসাদ। হঠাৎ তার গলাটা যেন দপ করে জ্বলে ওঠে। জ্বলতে থাকে তার প্রতিটা রক্তকোশ, প্রতিটা লোমকূপ। তার সমস্ত শরীর জুড়ে যেন বইতে থাকে গলন্ত লাভাস্রোত। প্রতিটি শিরা-উপশিরা যেন জ্বলে ওঠে পাহাড়ি জুমচাষের পর জ্বালানো অগ্নিশিখার মতন। লালচে-হলুদ চোখ বন্ধ করে চৈতন্য হারায় শিউপ্রসাদ।

****

গভীর রাতে হঠাৎ করেই ঘুম ভেঙে যায় মঞ্জুরার।

সারাদিন শরীর ও মনের ওপর দিয়ে বড়ো ধকল গেছে তার। সকালে আর্মির লোকের হাতে থাপ্পড়টা খাবার পর দরজার সামনে অনেকক্ষণ আচ্ছন্ন হয়ে পড়ে ছিল সে। তারপর ধীরেসুস্থে উঠে খানিকক্ষণ থুম মেরে বসেছিল উঠোনে।

কিন্তু অপমানের থেকে পেটের দায় অনেক বড়ো। খিদে বড়ো অবাধ্য জিনিস, তার ব্যবস্থা দেখতেই হয়। তবে সুবিধে এই যে নয় নয় করেও এ ঘরের অনেক কিছুই চেনা তার। কেরোসিনের স্টোভ ধরায় সে; আনাজপাতির বাক্স হাতড়ায়। তারপর চালে-ডালে খিচুড়ি বানাতে কতক্ষণ?

ফিরে এসে শুধু খিচুড়ি খাবে লোকটা?

দোকানপাট সব এখনও বন্ধ। এদিক-ওদিক দেখে বেরিয়ে পড়ে সে, এবং আরজিকরের দিকে হাঁটতে থাকে। আর কপালগুণে ওভারব্রিজের নীচে একটা মোমবাতি জ্বালা, ছোটো, আধাখোলা, নোংরা গুমটি পেয়ে যায় সে। আঁচলের

ময়লা খুঁট থেকে দশটা টাকা দিয়ে সেখান থেকে দুটো ডিম কিনে ফের শিউপ্রসাদের ডেরায় ফিরে আসে মঞ্জুরা।

বিকেল নাগাদ যখন আর্মির লোকজন শিউপ্রসাদের আধা অচৈতন্য শরীরটা দিয়ে যায়, স্নান করে তখন মঞ্জুরা ঘরে চুপচাপ শুয়েছিল। মিলিটারি জিপের আওয়াজ শুনে আর তারপর দরজায় আওয়াজ হতে ছুটে যায়। বডিটা নেওয়ার সময় একটু চোয়াল শক্ত হলেও, কিছু বলেনি সে।

"বেহোঁশ হো গ্যয়ে থে জনাব। বুখার ভি হ্যায়, লেকিন ডক্টরনে বোলা কলতক ঠিক হো যায়েগা। ইয়েহ লে, দওয়াই ভি লেকর আয়ে হ্যায়, অওর ইয়ে উসকা প্রেসক্রিপশন, সাম্ভহাল ইসকো। কমান্ডান্ট সাব বোলে হ্যায় জ্যায়াদা তকলিফ হোনে সে উনকো ফোন করনে কে লিয়ে, ইয়ে লে, নাম্বার লে।" বলে একটা কাগজ ধরা হাত এগিয়ে আসে মঞ্জুরার দিকে।

সেই হাতে একটা নতুন ব্যান্ডেজ বাঁধা। হাতের অধিকারী জওয়ানটি যাবার আগে অবশ্য একবার লোলুপ দৃষ্টি দিয়ে মঞ্জুরার শরীরটা মেপে নিতে ছাড়েনি। গায়ের আঁচলটা আর-একটু টেনে সে ভাবলেশহীন ভাবে দরজাটা বন্ধ করে শিকল তুলে দেয়।

আর তারপরেই ছুটে এসে শিউপ্রসাদের গায়ে হাত দিয়ে দেখে প্রবল জ্বরে পুড়ে যাচ্ছে তার সমস্ত গা। কোনোমতে টানতে টানতে শরীরটা কলতলায় এনে ফেলে মঞ্জুরা। বহু কষ্টে ফতুয়াটা খোলে, আর পরম মমতায় অল্প অল্প করে জল দিয়ে মাথা ধুইয়ে দিতে থাকে।

আর তখনই ব্যাপারটা লক্ষ করে সে। কয়েক ঘণ্টাতেই হাত দুটো কেমন দীর্ঘ ও স্ফীত হয়ে পড়েছে শিউপ্রসাদের। আঙুলগুলো অস্বাভাবিক মোটা আর লম্বা হয়ে গেছে, নখগুলো আরও বেড়ে হয়ে পড়েছে হিংস্র ও সূচালো। গায়ের চামড়া অত্যধিক খসখসে ও রুক্ষ, আবছা কিছু চৌকো চৌকো দাগ

দেখা যাচ্ছে।

তবে সবচেয়ে অদ্ভুত ঘটনাটা ঘটেছে মুখের সঙ্গে। মুখটা কেমন লম্বাটে আর ফ্যাকাশে দেখাচ্ছে। ঠোঁট, নাক আর কপাল যেন ঠেলে বেরিয়ে আসতে চাইছে। চুপসে গেছে রোজের মদ খাওয়ার চিহ্নস্বরূপ ভারী গাল দুটো।

থরথর কাঁপতে থাকে মঞ্জুরা। হায় আল্লাহ, এ কোন্ রোগ বাঁধিয়ে এনেছে লোকটা? দোকানের কর্মচারীদের খবর দেওয়ার উপায়ও নেই, দিয়ে লাভও নেই, তারা আসতে পারবে না। একাই সেই অচৈতন্য শরীরটাকে ধরে ধরে ঘরে তোলে সে। ঘামে, জলে ভিজে জবজবে হয়ে যাওয়া শরীর থেকে জামাকাপড় খুলে দেয় সে, নতুন জামা পরায়।

খানিকক্ষণ পর চোখ খুলে ধীরে ধীরে উঠে বসে শিউপ্রসাদ, হিসহিসানি মেশানো ঘড়ঘড়ে গলায় বলে, "ভুখ লাগি হ্যায়, খানা লাগা।"

লালচে-হলদে চোখ দেখে আশঙ্কায় বুক দুরু দুরু করে মঞ্জুরার। আজকের রাতটা কাটুক, কাল সকালেই হাসপাতালে নিয়ে যাবে সে। দরকার হলে আর্মির দেওয়া ফোন নম্বরে ফোন করেই।

দুর্বল হাতে খিচুড়ি আর ডিমসিদ্ধ খেতে থাকে শিউপ্রসাদ, মোটা, ফুলে যাওয়া আঙুলের ফাঁক দিয়ে পড়ে যেতে থাকে গরম খিচুড়ি। স্পষ্ট বোঝা যায় গিলতেও কষ্ট হচ্ছে তার, দু-একবার ওয়াকও তোলে সে।

আর তখনই দেখতে পায় মঞ্জুরা।

লোকটার দাঁতগুলো অমন বাঁকাট্যারা হয়ে উঠল কী করে? জিভটা অমন লম্বাটে আর লালচে দেখাচ্ছে কেন? জিভের মাঝখানেও কালচে দাগটা কীসের?

কোনোক্রমে খাওয়া শেষ করে ওষুধ খায় শিউপ্রসাদ। বা খাইয়ে দিতে হয়। কোনোমতে হাত ধোয়। বা ধুইয়ে দিতে

হয়। তারপর সে স্থির হয়ে খাটের ওপর বসে থাকে।

"কী হল? বসে আছো কেন? শুয়ে পড়ো না", ভয় লাগে মঞ্জুরার।

"ওরা বলছে আমাকে যেতে হবে", শিউপ্রসাদের গলা চিরে আসা হিসহিসে ঘষা আওয়াজ শুনতে কষ্টই হয় মঞ্জুরার, কিন্তু বক্তব্যটা না বোঝার বিস্ময় তাকে আরও বিচলিত করে তোলে।

"কী হয়েছে বুঝলাম না। কারা কী বলছে? কোথায় যেতে হবে?"

"চায়না যানা পড়েগা রে মঞ্জুয়া। উস চিড়িয়াকো খানা খিলানে কে লিয়ে, রোজ কা রোজ। উয়ো লোগ বহোত বড়া পিঞ্জরা লায়া হ্যায়, ইয়ে চিড়িয়া মহারাজ কো লে যানেকে লিয়ে। কল হি উসে লে যায়েগা, অওর মুঝে ভি যানা পড়েগা রে, ওয়সি হি অর্ডার আয়া হ্যায়।"

দপ করে মাথাটা গরম হয়ে যায় মঞ্জুরার, "মগের মুলুক নাকি, অ্যাঁ? বললেই যেতে হবে? দেশে আইনকানুন নেই? গরমেন নেই? পেচ্ছাপ করি অমন অর্ডারের মুখে।"

"অর্ডার আয়া হ্যায় রে, গবরমেন কা হি অর্ডার। আমাকে যেতেই হবে, কোই চারা নেহি হ্যায় রে। চিড়িয়াটা আমার হাতে খানা খায় যে।"

"বললেই হল, কার বাপের কত হিম্মত দেখি জোর করে নিয়ে যায়। ওষুদ তো ওরা নিজেরাই দিয়ে গেল, জানে না তোমার শরিলের অবস্তা? এই জ্বরের মধ্যে... হারামির বাচ্চাদের কি মাথায় গোবর আছে নাকি?" ফুঁসতে থাকে মঞ্জুরা।

"যানা পড়ে গা, যেতে হবে রে, আমাকে যেতে হবে", মাথা দোলাতে দোলাতে বারবার একই কথা সুর করে বলতে থাকে শিউপ্রসাদ। লম্বাটে হয়ে যাওয়া মুখটার ছায়া দেয়ালে

পড়ে বীভৎস দেখায়। ঠান্ডা হিসহিসানির সুর অজানা অশুভ মন্ত্রের মতন ছড়িয়ে পরে প্রায়ান্ধকার ঘরে।

গা-টা শিউড়ে ওঠে মঞ্জুরার, ধাঁধা লেগে যায় চোখে। এই লোকটাকে চেনে ও?

হঠাৎ করে মাথা দোলানি থামায় শিউপ্রসাদ, "তুই যাবি আমার সঙ্গে? হাঁ রে মঞ্জুরা, চলেগি মেরে সাথ?"

কলতলায় বাসন মাজতে মাজতে বিড়বিড় করে একবার মানত করে মঞ্জুরা, কাল ও নিজেই যাবে আর্মির সঙ্গে কথা বলতে, না হলে দিল্লি গিয়ে ধরনা দেবে। মগের মুল্লুক নাকি? সব ঠিক হয়ে গেলে আর লোকটা সেরে উঠলেই ও কুলতলির মাজারে চাদর দিয়ে আসবে। হায় আল্লাহ, কথা নেই বার্তা নেই এইভাবে কেউ কাউকে বাড়িঘর থেকে বার করে জোর করে অন্য কোথাও পাঠায় নাকি? হারামির গরমেন্ট শালা, বিড়বিড় করে মঞ্জুরা, তারপর নিজে খেয়েদেয়ে, বাসন মেজে, গুছিয়ে রেখে গিয়ে শুয়ে পড়ে।

রাত তখন ঠিক কটা বলতে পারবে না মঞ্জুরা, বুকের ওপর অভ্যস্ত হাতের স্পর্শ পেয়ে ঘুম ভেঙে যায় তার। ঘুম চোখেই ব্লাউজের হুকগুলো খুলতে থাকে সে, একটু বিরক্তিও আসে। ব্যাটাছেলে মাত্রেই এইরকম, এত জ্বর লোকটার গায়ে, তাও দেখো আজকেও চাই। আরে পালিয়ে যাচ্ছে নাকি ও? শায়ার দড়ি খুলতে খুলতে ভাবে মঞ্জুরা।

পরক্ষণেই সাপের মতন মোচড় দিয়ে ওর বুকের ওপর উঠে আসে শিউপ্রসাদ, দু-হাত দিয়ে মঞ্জুরার গাল দুটো চেপে ধরে আর তার কর্কশ, তীব্র তপ্ত ঠোঁট দুটো নেমে আসে মঞ্জুরার ঠোঁটের ওপর। গভীরতম আশ্লেষে সে চুমু খায় মঞ্জুরার ঠোঁটে, চুষতে থাকে স্থূল ঠোঁট দুটি। আর সরু, দীর্ঘ হিলহিলে জিভ ঢুকিয়ে দেয় তার মুখে...

আর দপ করে জ্বলে ওঠে মঞ্জুরার সারা শরীর। মাথার

চুল থেকে পায়ের নখ অবধি প্রতি রক্তস্রোতে বয়ে যায় শানিত লাভার নদী। মনে হয় কে যেন শরীরের খাঁজে খাঁজে মোমের মশাল জ্বালিয়ে দিয়েছে। গলিত মোম ফোঁটায় ফোঁটায় পড়ে জ্বলতে থাকে মঞ্জুরার গলা এবং হাতের চেটো দুটি, পুড়ে যায় ঘাড় ও দুই বাহুমূল।

দীর্ঘ চুম্বনের পর মঞ্জুরার নীচের ঠোঁটটা চুষতে চুষতে স্থির হয় শিউপ্রসাদ। লালচে-হলুদ চোখ মেলে সে তাকিয়ে থাকে শরীর দিয়ে ভাড়া মেটানো এই হাফগেরস্ত মেয়েটার দিকে, আর হাত দিয়ে তার মাথার চুলে বিলি কেটে দিতে থাকে।

আর তার কয়েক সেকেন্ড পরেই দুই জোড়া চোখ খুলে যায় শিউপ্রসাদের চোখের সামনে।

লালচে-হলুদ দুটো চোখ।

তারপর বিছানায় দুটো লাভা স্রোতের শঙ্খ লাগে যেন।

কীসের জন্যে ঘুম ভেঙে গেল প্রথমে বোঝেনি মঞ্জুরা। শুধু টের পায় গায়ে অসম্ভব জ্বর তার। শুকনো মরুভূমির মতন গলা বুক তার, যেন জ্বলে ছাই হয়ে যাচ্ছে। কোনোমতে উঠে বসে সে, মাথাটা যেন যন্ত্রণায় ছিঁড়ে যাচ্ছে। মেঝেতে রাখা জলের জাগটার দিকে আন্দাজে হাত বাড়ায় মঞ্জুরা, আর তক্ষুনি খোলা দরজা দিয়ে ঝাঁপিয়ে আসা পূর্ণিমার আলোয় দেয়ালে তার হাতের ছায়া পড়ে।

কার হাত এটা? এই স্ফীত, বলিষ্ঠ, লম্বা হাতটা কার? এই কঠিন দীর্ঘ প্রেত নখরগুলি কার?

আর চুল কই? তার মাথার দীর্ঘ কেশরাশি কোথায়? তার মুখটা অত দীর্ঘ দেখাচ্ছে কেন? তার চামড়া এরকম আঁশ-আঁশ হয়ে উঠল কী করে?

মাথার ভেতরটা শূন্য হয়ে যায় মঞ্জুরার। কোনোমতে মেঝেতে পা রাখে। এবং টের পায় যে থরথর কাঁপতে থাকা

পা-দুটির চেটো আরও থ্যাবড়া ও ছড়ানো হয়ে গেছে। লম্বা বাঁকানো নখগুলি মেঝেতে খররর খররর আওয়াজ তোলে।

নির্বাক আচ্ছন্ন প্রেতের মতন উঠে দাঁড়ায় মঞ্জুরা। খসে পড়ে তার বসন ও আবরণ, এবং সে টের পায় যে এখনও তার আতঙ্কিত হওয়া বাকি আছে।

তার শরীরের দুই দিকে দুই বাহুমূল থেকে পিঠ জুড়ে এক মাংসল পর্দা গজিয়ে উঠেছে ইতিমধ্যেই। দ্রুত সেই পর্দা দুটি বাড়ছে আয়তনে, আরও স্থূল ও শক্ত হয়ে উঠছে। এবং কোনো এক বোধ অলৌকিক দৈববাণীর মতনই দ্রুত তার অবচেতন থেকে চেতনে উঠে আসে, যে এই পর্দা দুটি সে ইচ্ছে করলেই নাড়াতে পারে।

এই দুটি তার শরীরের অংশ।

তার ডানা।

থপথপ করে মেঝেতে শিউড়ে ওঠার মতন আওয়াজ তুলে সে বাইরে আসে, আর স্তম্ভিত বিস্ময়ে স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে যায়।

ও কে দাঁড়িয়ে উঠোনে? দুদিকে বিস্তীর্ণ ডানা, মোটা লেজ ছড়িয়ে আছে দেহের একপাশ জুড়ে। লম্বা মুখ আর বলিষ্ঠ আঁশ-আঁশ হাত।

ঠিক যেন নেতাজি মূর্তির ওপর বসে থাকা বড়ো আগুনপাখিটার মতন না?

মঞ্জুরার পায়ের আওয়াজে এদিকে ফেরে সেই প্রাণীটি। লালচে-হলুদ চোখে মঞ্জুরার দিকে তাকিয়ে থাকে খানিকক্ষণ, আর তারপর মুখ নাড়িয়ে কিছু ঘষা ফিসফিসানি আওয়াজ ছুড়ে দেয় সেইদিকে।

এবং মঞ্জুরা স্পষ্ট বোঝে সেই শব্দসমষ্টি তার কানের পর্দায় পড়ে বোধগম্য ভাষা তৈরি করছে।

আশ্চর্যের সঙ্গে মঞ্জুরা বোঝে যে প্রাণীটি তাকে বলছে,

"চল রে মঞ্জুয়া, পালিয়ে যাই, যাবি? চল একসাথে পালিয়ে যাই চল।"

তীব্র বিস্ময় আর আতঙ্কে দিশেহারা মঞ্জুরা চেঁচিয়ে জিজ্ঞেস করতে যায়, "কোথায়? কোথায় যাব নিজের বাড়িঘর ছেড়ে?" এবং তার গলা থেকে অনুরূপ ঘষা ফিসিফিসানি ছাড়া কিছুই বেরোয় না।

"উড়ে চল না, মঞ্জুয়া, চল না আমার সাথে। হাম দোনো তো অ্যায়সে হি আভি বেঘর, বেজাত হ্যায়। চল পালিয়ে যাই, এখান থেকে উড়ে যাই, চল উড়ে যাই, চল উড়ে যাই..." বলতে বলতে সেই প্রাণীটি এসে দাঁড়ায় মঞ্জুরার সামনে, দুটি বলিষ্ঠ হাত ও ডানা মেলে জড়িয়ে ধরে মঞ্জুরাকে।

তার কিয়ৎক্ষণ পরে দুটি ড্র্যাগনের তীব্র ও তীক্ষ্ণ কান্নার শব্দ ছড়িয়ে যায় উত্তর কলকাতার আকাশে। তাদের অব্যক্ত ক্রোধ, ঘৃণা আর অসহায়তা যেন আগুনে বিষ হয়ে মিশে যেতে থাকে সেই কালরাত্রির সঙ্গে।

আর ঠিক সেই মুহূর্তে নেতাজি মূর্তির দিক থেকে ভেসে আসে আর-এক তীক্ষ্ণ জান্তব আর্তধ্বনি, আরও প্রখর, আরও বিস্তৃত। তার মিনিট খানেক পরেই বিশাল ডানা মেলে, সদ্য ঘুমভাঙা এক কোম্পানি আতঙ্কিত জওয়ানের চোখের সামনে, উড়িয়ে আনা প্রশিক্ষিত শিকারিদের হতবাক করে দিয়ে, টাংস্টেন খাঁচার ওপর দিয়ে উড়ে আসে সেই প্রাচীন ড্রাগন, এসে বসে শিউপ্রসাদের ঘরের ছাদে। নখের টানে উপড়ে আনে সেই ছাদের অ্যাসবেস্টস নির্মিত করুগেটেড চাল। তুলে আনে পচে যাওয়া বাঁশের কাঠামো। তার লেজের এক ঝটকায় ভেঙে পড়ে লাগোয়া দোকানঘরের পুরোনো পাঁচিল। সেখান থেকে ভেসে আসা দেশীয় মদের উগ্র নেশালু গন্ধ আস্তে আস্তে বাতাস ভারী করে তুলতে থাকে।

তারপর দরজার কাছে নেমে আসে সেই বিহঙ্গরাজ।

ডানা গুটিয়ে বসে দুজনের সামনে, ঘাড় নাড়িয়ে যেন ইঙ্গিত করে তাদের।

কিছু কি কথা হয় তাদের মধ্যে? আগুনপাখিরা কি আগুনে আখরে লিখে রাখে তাদের স্মৃতিবচন?

আর তারপর অসময়ে জেগে ওঠা যাবতীয় হতভম্ব চোখের সামনে দিয়ে উড়তে শুরু করে সেই তিন ড্রাগন। প্রথমে তারা আকাশে একচক্কর কাটে। তারপর নেতাজি মূর্তিকে একপাক ঘুরে তারা সোজা উড়তে থাকে, আকাশে তখন পূর্ণিমা রাতের ম্লান বিধূর শেষ চাঁদ। সেইদিকে সোজা লক্ষ করে, তিনটি স্বাধীন ড্রাগন উড়তেই থাকে, উড়তেই থাকে।



দাগ

ছেলেটা উঠে যাবার পরেও পা দুটো ফাঁক করে অনেক্ষণ আচ্ছন্নের মতন শুয়ে থাকে কুন্তী, কুন্তী দুসাদ। মনে হচ্ছিল ওর সারা শরীরে রোড রোলার চালিয়ে গেছে কেউ। থাই দুটো জমে পাথর। না তাকিয়েও মানসচক্ষে বুকে আর থাইয়ের ওপর জমাট বেঁধে থাকা কালশিটেগুলো স্পষ্ট দেখতে পায় কুন্তী। ওর এই পঁয়ত্রিশ বছরি বেবুশ্যে জীবনে শুকিয়ে যাওয়া চোখে অনেকদিন বাদে জল আসছিল ওর।

পাশে পড়ে থাকা শায়াটা দিয়ে বুকের সামনে ধরে কোনোমতে উঠে বসে কুন্তী। ছেলেটা তখন জাঙিয়া পরছিল সামনে দাঁড়িয়ে। কুন্তী উঠে বসেছে দেখে হাসতে হাসতে লিঙ্গটা একবার কুন্তীর মুখের সামনে নাড়িয়ে নেয়, গুটখার ছোপ লাগা দাঁতগুলো বার করে বলে, "কিঁউ বে সালি, ফিরসে একবার চুসেগি কেয়া?"

কুন্তীর গা গুলিয়ে ওঠে, মুখ বিকৃত করে খিস্তি দেয়, "হঠা বে লওড়ে। তেরা টাইম হো গ্যায়া, আব নিকল হিঁয়াসে।"

ছেলেটা অবশ্য তাড়াহুড়োর কোনো লক্ষণ দেখায় না। মুখে একটা তাচ্ছিল্যের, আনন্দের, বিদ্রুপের জান্তব হাসিটা ঝুলিয়ে রেখে, খ্যাক খ্যাক করে হাসতে হাসতেই প্যান্টটা গলিয়ে চেনটা টেনে নেয়। যেন এতক্ষণ ধরে টাকা দিয়ে ভাড়া নেওয়া একটুকরো জ্যান্ত মাটিতে ইচ্ছেমতন নিজের পৌরুষ আর প্রতাপের পতাকা প্রোথিত করতে পারার অসহ্য তৃপ্তিটাই আলগা তাচ্ছিল্যের মতন ওর মুখে লেগেছিল।

কে বলবে একটা আঠেরো-উনিশ বছরের ছোকরার অত দম? ওহ, শুয়োর কা অওলাদ পুরো খাল খিঁচে নিয়েছে বে,

থাইয়ের ওপর ফোলা জায়গাটা হাত দিয়ে বোলাতে বোলাতে আড়চোখে ছেলেটার দিকে তাকায় কুন্তী। পয়সা দিয়ে রেন্ডি চুদতে এসেছিস বলে এইভাবে রাক্ষসের মতন খায় কেউ? মালটা ঢুকল যখন, দেখে তো মনে হল ভদ্দরলোকের বাচ্চা। অবশ্য খালপাড়ের রেন্ডির সামনে প্যান্ট খুলে আর কেই বা ভদ্রতা চোদাতে আসে আসানসোলের মতন এই আধা বিহারই আধা বঙ্গালি শহরে? জানোয়ারের জাত এই বিহারিগুলো, একদলা শুকনো থুতু ঘরের কোনায় ছুড়ে দেয় কুন্তী, নিজের জাতবেরাদরদের খুবই ভালো চেনে ও। এই হারামিটা তো আরও সরেস, ঢুকেই আলো নিভিয়ে দেয়, আর তারপরেই কাপড় খুলে দনাদ্দন চার্জ করা শুরু! আর তার সঙ্গে অকথ্য খিস্তি দিচ্ছিল, উফফ, এখনও কান গরম হয়ে আছে কুন্তীর। পনেরো বছরের রেন্ডিগিরির লাইফ কুন্তীর, এমন খিস্তি আর কখনও শোনেনি ও! একবার ওর মায়ের নাম করে দুটো বাজে কথা বলতে মৃদু প্রতিবাদ করতে গেছিল ও, গালে একটা বিরাশি সিক্কার থাপ্পড় খেয়ে চুপ করে যায়।

অবশ্য রেন্ডি মানে রেন্ডি, তার বয়স যতই হোক।

জিনসটা গলিয়ে ছেলেটা এবার আদুড় গায়ে ঘরের একমাত্র আসবাব ভাঙা লাল রঙের চেয়ারটায় মৌজ করে বসে। পাশে একটা ময়লা পিঠের ব্যাগ থেকে দেশি দারুর একটা পাইট বার করে ও, তারপর ইঙ্গিতে কুন্তীকে বলে গ্লাস আর জলের বোতল নিয়ে আসতে। ছেলেটা বোতলের ছিপিটা খুলতে দেশি শরাবের উগ্র বন্য গন্ধটা ধক করে নাকে এসে লাগে কুন্তীর, আর তীব্র বিরক্তিতে এইবার ফুঁসে ওঠে সে, "আবে চুতিয়ে তেরা কাম হো গ্যায়া না? বোতল কিঁউ খোল রাহা হ্যায় বে? চল বে লওড়ে, আব নিকল হিঁয়াসে, নেহি তো মওসি গান্ড মে ডান্ডা গাঢ় দেগা তেরা।"

ছেলেটা অবশ্য হেলেদুলেই বসে। তারপর খুক খুক

করে হেসে বলে, "চার ঘণ্টে কা পয়সা দিয়ে হ্যায় তেরে মওসি কো, উসকে উপর সও রুপেয়া টিপস। আভি হামকো থোড়া রিল্যাক্স করনে দে বেব্বি। চল, আব ফটাকসে এক বোতল পানি লা, আউর দো দো গ্লাস। তুঝে ভি পিনি হ্যায় ইয়া নেহি?"

মওসিকে বিড়বিড় করে খিস্তি দিতে দিতে ওঠে কুন্তী। শায়াটা গলিয়ে নেয়, জীর্ণ হয়ে যাওয়া ফাটা কাঁচুলিটা টেনেটুনে পরে ফ্যালে, নখরে দেখো হারামজাদে কি! তারপর দুটো গ্লাস আর প্লাস্টিকের বোতলে জল নিয়ে এসে বসে।

প্রথম চুমুকটাই গলা আর বুক জ্বালিয়ে দেয় কুন্তীর, একটা জ্বলন্ত আগ্নেয়গিরিই যেন ওর কণ্ঠা জ্বালাতে জ্বালাতে নামতে থাকে ওর শুকনো বুকে। ওফ কেয়া জহরিলি দারু লায়া হ্যায় বে ইয়ে?

রেললাইন বস্তির লছমির মাল নাকি?

লছমিও একসময় ওর মতোই লাইনওয়ালি ছিল। তারপর একদিন আসানসোলের বেতাজ বাদশা ইন্দর সিং এর সুনজরে পড়ে যায়। তারপর... তারপর আর কী? কয়েকদিন ইন্দর সিং-এর বাঁধা রাখেলগিরি, পরে বয়স হলে ইন্দরই ওকে এই ভাঁটিটা করে দেয়। তখন অবশ্য ইন্দর নতুন কবুতরি পেয়ে গেছে, নাজনিন বলে একটা ইউপির মেয়ে। লছমি বেশি রা কাড়েনি, এমনিতেও এ অঞ্চলে ইন্দর সিং এর সঙ্গে পাঙ্গা নিতে গেলে গাঁড়ে দম লাগে, তার ওপর পোষা রাখেলের রিটায়ারমেন্ট সবসময়ই বড়ো জলদি হয়, নতুন পাখি পেলেই চিড়িয়া উড়! লছমি বরং ওর ভাঁটির ধান্দাতে জ্যাদা ধেয়ান দিয়ে দোহাত্তা কামাতে থাকে। নর্মাল চুল্লুর সঙ্গে ব্যাটারির জল মিশিয়ে কি একটা মিক্সচার বানিয়েছে, নাম দিয়েছে ফুটুশ। এক-একটা চুমুকেই নাকি দিল একেবারে সাত দরিয়া পার রঙ্গিলা আসমানে ছুপ্পন ছুপাই খেলতে থাকে।

অবশ্য লোকে ফুটে যেতেও বেশি টাইম নেয় না, মালটার নামই ফুটুশ!

প্রথম ঢোঁকের ধাক্কাটা সামলে টেঢ়া চোখে ছোকরার দিকে তাকায় কুন্তী, উমর মে তো পন্দরাহ সে সোলা বরসের ছোটোই হবে ছেলেটা ওর থেকে। কিন্তু অন্য একটা চিন্তা দ্রুত কুন্তীর মাথায় খেলে যায়। এই পঁয়ত্রিশ-ছত্তিরিশ বছর বয়সে আর এই শুকনো রোগাভোগা চেহারায় আর তো কোনো বাবুও জোটাতে পারবে বলে মনে হচ্ছে না। কাপড়া-উপড়া দেখে তো এই মালটাকে পয়সাওয়ালা লেড়কা মনে হয়।

একটু এক্সট্রা ছেনালি করে দেখবে নাকি ও? যদি একটা বাবু মিলে যায় ওর? এই বয়সে?

চিন্তাটা মাথায় খেলে যেতেই একটু সচকিত হয়ে ওঠে কুন্তী। ওদিকে ছেলেটাকে প্রথম গ্লাসেই তীব্র বেপথু মনে হয় ওর। চোখ সরু করে ছেলেটার নড়াচড়া লক্ষ করে ও, আহা যদি হারামিটার ভালো লেগে যায় ওকে? পিছলে যেতে দেওয়া চলবে না ওকে, উঁহু কিছুতেই না। বহুদিন হয়ে গেল, একটা বাঁধা বাবু নেই কুন্তীর। বাঁধা বাবু ছাড়া বেশ্যার আর থাকেটাই বা কী, অ্যাঁ? আর বেশ্যার শেষ জীবনের সম্বল বলতেই বা কী থাকে?

থাকে ভরা যৌবনের সময় এক-একটা বাবু ধরে ধরে, তাদের একটু একটু করে নিঃস্ব করে নিয়ে, শেষ বয়সের জন্যে কিছু জমিয়ে রাখা বিদুরের খুদ। বেশ্যার যৌবন আর গঙ্গা মাইয়াকি পানি, এর থেকে দ্রুত আর কীই বা বয়ে যায় সময়ের উপত্যকা বেয়ে?

কুন্তীরও কি ছিল না? ভরা জওয়ানিতে কলকাতার বাঙালি আর মাড়োয়ারি বাবুদের ধরে ধরে কম পয়সা কামিয়েছে নাকি ও এককালে? সেই বাজোরিয়া নামের ছেলেটা তো হিরের হার অবধি এনে দিয়েছিল ওদের পারিবারিক

দোকানের পুঁজি ভেঙে। সোনার দুল আর আংটি কম পেয়েছে নাকি কুন্তী দোসাদ? একজীবনে কম পয়সা কামিয়েছে সে? সোনাগাছির নীলকমলের কমলহিরে ছিল কুন্তী, ওরফে প্রিয়া। আকখা কলকাত্তা তার জওয়ানির নেশায় বুঁদ ছিল একদিন। গড়িয়া সে ডানলপ তক, শিলিগুড়ি সে খড়গপুর তক, রসিলা শওখিন লোকজন একডাকে চিনত তাকে। তার বিছানা গরম করতে দিল্লি, মুম্বাই থেকে ছুটে এসেছে লোক, এমনও হয়েছে কতবার! তখন ওর দাপট আর খুবসুরতি দুটোই মাশাল্লা লা-জবাব। ভেতর একজনকে নিয়ে ঢুকেছে কুন্তী, বাইরে মওসি আরও দুই কাস্টমারের সঙ্গে খোশগল্প করছে এমনটা চেনা ছবি ছিল ওর কোঠির বাইরে। তখন জোশ ছিল, জওয়ানি ছিল, পয়সাও কামিয়েছে বেতাহাশা।

এখন এই আসানসোল খালপাড়ের নোংরা রেন্ডি বস্তি দেখে সেসব দিন অলীক স্বপ্নের সোনালি বুদ্‌বুদ বলেই মনে হয় তার।

অথচ শুরুতে কেউ কি ভেবেছিল সিওয়ানের চিতাউলি গ্রামের ভাগচাষি রামচরণ দুসাদের একমাত্র লাডলি বিটিয়ারানি কুন্তীর এই হাল হবে? ভেবেছিল কেউ? এমনিতেই ওরা নীচু জাত, রাজপুত বা ভূমিহার বরাম্ভন দেখলে তাদের ছায়া মাড়ানোও ওদের কাছে পাপ। উঁচু জাতের মেয়েরা জল নিয়ে গেলে তবে ওদের ঘরে জল আসে, উঁচু জাতের চোখে চোখ রেখে, গলা তুলে কথা বলা অবধি নিষেধ। এইরকম পরিবারে মেয়ে হয়ে জন্মানো যে কতটা অভিশাপের তা জানার জন্যে হাত গুনতে জানতে হয় না, চোখ কান খোলা রাখলেই বোঝা যায়। পুরো বিহারে আল্ট্রাসোনোগ্রাফি শুরু হয়ে পাটনায় আর সিওয়ানে। গাঁয়ের ডাগদার সাব যেদিন মেশিন-উসিন লাগিয়ে বললেন যে ওর বিবির একটা নানহি-মুনহি মেয়ে হবে, সেদিন তো ওদের ফ্যামিলিতে গভীর দুঃখের লহরই বয়ে গেছিল

একটা। রামচরণের মা তো এই কালমুহি, জনমজলি বহুকে ফের বাড়ি নিয়ে তীব্র আপত্তি তুলেছিল। বংশের প্রথম বাচ্চাই মেয়ে? হায় হায়, অমন অপশকুম বউয়ের মুখে নুড়ো জ্বেলে দিতে হয় না? আর ধাই মা তো গোদ গিরানেকা সামান আনার অর্ডারও দিয়ে দিয়েছিল, হাজার হোক বাচ্চি গিরানোর টাকাতেই তার পেট চলে কি না।

বাধ সাধল রামচরণ নিজে। তার নাকি খুব মেয়ের শখ!

শুনে তো আসপড়োশের লোকেরা তো বেঝিঝক হয়রান! হায় দইয়া... তু কা বঙ্গালি বন গইল বড়অ? ই গাঁও কে কলকাত্তা সমঝ লে লে হউয়া ক্যে? কলকাত্তামে এই সব চলে রে পাগল... লোকে মেয়ে হলেও লেড়কা হোনে জ্যয়সা খুশিয়াঁ মানায় আর তারপর ধিঙ্গি ধিঙ্গি মেয়েগুলো মর্দানি কাপড়া-উপড়া পেহেনকে ইস্কুল কালেজ ওগ্যায়রাহ যায়, আর বেয়াহাপনা করে বেড়ায়। রাম রাম... ছোঃ। কেউ যায় ওই দলদলে কামকাজ করতে? নেহাতপক্ষে দুটো পয়সার জন্যে ও পাপ শহরে পড়ে থাকা। রামচরণ কি জানে না এই মেয়ে বড়ো হলে কী পরিমাণ দহেজ দিতে হবে পরে? ঠাকুর দেবেন্দ্র সিং-এর অগুনতি ভাগচাষিদের মধ্যে এক ছোটা বেজাত ইনসানের এই জিদ দেখে অবাক মেনে যায় দুসাদ সম্প্রদায়! যেদিন শেষ গাঁওয়ালা বুঢ়োউ ভি মাথা নাড়তে নাড়তে উঠে যায়, তার ঠিক পাঁচ মাস পরে ট্যাঁ ট্যাঁ করে ভূমিষ্ঠা হয় কুন্তী।

বাপের অগাধ, অপরিমেয় লাঢ় পেয়ারই বোধহয় কুন্তীর মাথাটা বিগড়ে দেয়। তখন ধীরে হলেও গাঁও দেহাতে সেই ম্যাজিকবাক্স আসা শুরু করে দিয়েছে, যার নাম টেলিভিশন। বড়োলোক প্রতিবেশীর বাড়িতে গিয়ে নিত্য টিভি দেখা অভ্যেসে দাঁড়িয়ে যায় তার। ক্রমশ টিভি, রেডিয়ো আর যাবতীয় গ্রাম্য বিনোদনের এক অলীক মায়াবী ঊর্ণনাভে নিজেকে জড়িয়ে ফেলতে থাকে রামচরণ দুসাদের মেয়ে কুন্তী দুসাদ।

শেষে একদিন বাল্যসখী দুলারি যেন নিয়তির রূপ ধরেই একদিন ওকে ডেকে নিয়ে যায় গাঁওয়ের ধনীতম জোতদার তুকারাম শুক্লার বাড়িতে। কোই নয়া মেশিনওয়া নাকি এসেছে মার্কেটে, তাতে করে সেদিন সনিমা দেখানো হবে শুক্লাজিদের বাড়িতে, সদ্য আগত দরওয়াজা-ওয়ালা ব্ল্যাক অ্যান্ড হোয়াইট টিভিতে।

সেদিনই 'এক দো তিন' দেখে ও, এককোণে জড়সড়ো আর পাঁচটা নীচ জাতের বাচ্চাকাচ্চার সঙ্গে। কৈশোরেই যেন সেই লাস্যময় মাধুরীবিভঙ্গ তার চৈতন্যে গেঁথে দেয় বসন্তের কুহুনির্ঘোষ।

সেই কুহুধ্বনি শুনেছিল আর-একজনও। সেদিনই।

তুকারাম শুক্লার ছোটো ছেলে বিনোদ শুক্লা। তখন তার বয়েস একুশ।

বাপ ও মায়ের অন্ধ আদরে বিগড়ে যাওয়া বিনোদের মেয়ে নাচানো অভিজ্ঞ চোখ ভুল করেনি কুন্তীর বাড়ন্ত দেহের ইঙ্গিত পড়ে নিতে। সেদিনই সে তার চামচা ও আড়কাঠি বাবুলালকে জানায় তার মনোগত বাসনা, এই উদ্ভিন্নযৌবনা অনাঘ্রাতা কিশোরীকে বিছানায় না পেলে, এ যৌবন নিয়ে সে কী করবে? নাহি চাহি হঁ কুছ অওর, হামরা হঁও চাহি!

পরের গল্প অতি সংক্ষিপ্ত। বছর খানেক পরে এক নিদাঘপীড়িত মধ্যাহ্নে স্নানরতা কুন্তীর দেহে মাতৃলক্ষণ দেখে আঁতকে ওঠে কুন্তীর মা। দু-চারটে জোরালো থাপ্পড়ের পর অবশ্য ভীত কুন্তীর স্বীকার করতে কোনো দ্বিধা ছিল না এই দেহমন কোন্ কালাচাঁদে সঁপেছে সে!

রামচরণ সোজা সরল মানুষ, খবরটা শুনে ঘরের দাওয়ায় খানিকক্ষণ থুম ধরে বসে থাকে সে। তারপর উঠে বাঁধানো লাঠিগাছাটা নিয়ে সে সোজা তুকারাম শুক্লার গদিতে গিয়ে হাজির।

"তাহার বেটুওয়া কা বিহা হামার বেটি সন করওয়াবে হে কে পঢ়ি।"

তুকারাম তো এই দুসাদের বাচ্চার বেহুদা সাহস দেখে অবাক, বলে কি গর্দাখোরটা? বলি দুসাদ চামারের মেয়েদের সঙ্গে অমন একটু-আধটু দুষ্টুমি বরাম্ভন, কি ভূমিহার, কি রাজপুতের ছেলেছোকরারা করেই থাকে, তাকে কি বিয়ের সওগাত ভাবতে হবে না কি? বলি জাতধরম, বেজাতের ছুঁই-অছুঁই, সমাজবিধি, সবই কি গাধার গাঁড়ে দিয়েছে নাকি হারামিটা? আহা, হিরের টুকরো ছেলেছোকরা সব, ওদেরও তো একটু খেলার মাঠ-টাঠ চাই, না কি? আর নীচুজাতের মেয়েগুলো তো জন্মেছেই ওই জন্য! এর জন্যে অমন সোনার চাঁদ বিনোদের সঙ্গে এই নাচনিয়া, ফুলঝরি মওগিটার সঙ্গে বিয়ে দিতে হবে? এই হারামি দুসাদটার কি মাথা খারাপ হয়ে গেছে? "আব্বে ভোঁসড়ি কে", ঠিক এই ভাষাতেই রামচরণকে বোঝাবার চেষ্টা করেছিল তুকারাম (অছুত ছোটোলোকগুলো আর কোন্ ভাষাটাই বা বোঝে, অ্যাঁ?), "তাহার মাথা খারাব হো গ্যইল বা ক্যা? আব কা করি, তাহার বেটিকে সঙ্গ বিহা করওয়াবে কে পঢ়ি ক্যা? আব ই দিন আ গ্যইল বা কা বরাম্ভন কি ঘরে দুসাদ চামার কি বেটি বিহা হো ক্যে আই? সুন লে রে রামচরণ, তোহরে বেটি কা চলন ঠিক নেহি ক্যে বা, উ কুতিয়া সালি ল্যইকি আপন তিরিয়া চরিত্তর সে ল্যইকান কে ফাঁসাওত বারি..."

তখন বিহারে অগ্নিগর্ভ সময়, আস্তে আস্তে দরিদ্র নিপীড়িত নীচবর্ণের লোকেদের সংগঠিত করছে সিপিআইএম লিবারেশন, লোকে বলে 'মালে'। তাদের সঙ্গী লালসেনার বন্দুকের নলের নিশানায় প্রতিটি উচ্চবর্ণের জমিদার, জোতদার ও সম্পন্ন চাষি। ওদিকে উচ্চবর্ণের জমিদারেরাও চুপচাপ বসে ছিল না, সানলাইট সেনা, ব্রহ্মর্ষি সেনার নামে তারাও তৈরি

করছিল তাদের ভাড়াটে খুনির দল। পরবর্তীকালে এসব দল মিশে গিয়ে তৈরি করবে ভারতের ইতিহাসের কুখ্যাত গণহত্যাকারী মিলিশিয়া রণবীর সেনা, তার নেতা হিসেবে উঠে আসবে শীতল ও স্থির মস্তিষ্কের এক খুনি, মুখিয়া ব্রহ্মেশ্বর সিং।

সেই রাতেই রামচরণ যোগাযোগ করে লালসেনার সঙ্গে।

কাহানি বেশ পেকে আসার আগেই এক বর্ষার রাতে বিনোদের সঙ্গে ঘর ছাড়ে কুন্তী। লম্পটটা কুন্তীর মধ্যে কী দেখেছিল কে জানে? তখন কুন্তী আট মাসের গর্ভবতী। কাজটা বিপজ্জনক ছিল বলা বাহুল্য, তবে কুন্তী চেয়েছিল...

কী চেয়েছিল আজ আর মনে পড়ে না তার।

ছেলেটা এতক্ষণ নেশার ঘোরে কী বকবক করে যাচ্ছিল মনে ছিল না কুন্তীর। হাসি হাসি মুখে তাকিয়ে অঘোরে নিজের কথা ভেবে যাচ্ছিল সে, চটকাটা ভাঙে ঘরের কোণে ওঁয়া ওঁয়া ডাকটা শুনে।

চমকে ওঠে ছেলেটা, "কিসকা রোনে কা আওয়াজ হ্যায় রে? কোই বাচ্চাউচ্চা হ্যায় কা?"

বিরক্তি ও লজ্জায় মরে যাচ্ছিল কুন্তী। হারামিটা কেঁদে ওঠার আর সময় পেল না? একরাশ বিব্রতভাব আর অনেকটা ছেনালিগিরি মিশিয়ে বলে ওঠে সে, "বিটিয়া হ্যায় হামার।"

"আরে ব্বাপ রে, বাচ্চিকো ঘর মে সুলাকে রেন্ডিবাজি চল রহি হ্যায় তেরি? ক্যায়াসা মাল হ্যায় বে তু?"

থাপ্পড়টা মারার জন্যে হাতটা নিশপিশ করে উঠছিল কুন্তীর। তারপর বহু কষ্টে নিজেকে সংযত করে সে, "ক্যায়া করে লাভার, দো মহিনে কে বাচ্চে কো রাস্তে মে ছোড়কে তো ইয়ে কাম নেহি কর সকতে হ্যায় না?"

কামকাজের সময় ছোটো বাচ্চাউচ্চা মওসির কাছে রাখতে হলে নিজের বখরার ওপর পচাস রুপেয়া এক্সট্রা নেয়

মওসি, কথাটা আর ভাঙে না সে। কুন্তী নিজেও কি এক সময় চায়নি এই দু-মাসের রক্তপুঁটুলিটাকে সত্যি সত্যি কলকাতার কোনো ডাস্টবিনে ফেলে দিতে?

বুকটা যেন থমকে যায় কুন্তীর। কী যে দেখেছিল সে, সেই মুখার্জিবাবুর মধ্যে? আধবুড়ি, পঁয়ত্রিশ বছুরে রেন্ডিটাকে সংসারের স্বপ্ন দেখিয়েছিল তো ফিলিম লাইনের মুখার্জিবাবুই! মওসি থেকে শুরু করে চম্পা, পূজা, রামধনিয়া, নেপালি মেয়েটা... কী যেন নাম... জুন, সবাই কি কম বুঝিয়েছে ওকে? এতগুলো শুভানুধ্যায়ীদের কথা উপেক্ষা করে এত বড়ো ভুলটা সে কী করে যে করল, এই ক-টা মাস সেই ভেবেই কেটেছে কুন্তীর।

কে জানে, কলকাতা শহরের নামি বেশ্যা প্রিয়ার মনের কোনো একটা কোণে সিওয়ানের চিতাউলি গ্রামের সেই ছোট্ট কিশোরী কুন্তীর সংসার করার ইচ্ছেটা কেন মরতে মরতেও মরেনি।

হাজারোঁ খোওয়াইশেঁ অ্যায়সি, কে হর খোয়াইশ মে দম নিকলে।

বাচ্চাটার কান্নার শব্দটা বাড়ছিলই। স্পষ্টতই বিরক্ত হচ্ছিল ছেলেটা, “চুপ করা না উসকো।”

ফাঁপরে পড়ল কুন্তী। বাচ্চাটা কেন চেঁচাচ্ছে স্পষ্ট বোঝে ও। খিদে পেয়েছে ওর। কিন্তু এখন সামনে কাস্টমার বসিয়ে কি আর বুকের দুধ খাওয়ানো যায় তাকে? এদিকে আওয়াজ উত্তরোত্তর বাড়তেই থাকছে বাচ্চাটার।

ভয় পেয়ে গেল কুন্তী, এই ছেলেটাও যদি হাত ফসকে যায়? হাতে একটা পয়সা নেই ওর। এই বুড়ি বয়সে একটা বাঁধাবাবু থাকলে...

ক-গ্লাস খেয়েছে সে কথা খেয়াল ছিল না কুন্তীর। মাথাটা তার আর কাজ করছিল না বিশেষ, অংশত মানসিক চাপে।

অংশত লছমির ফুটুশের কল্যাণে।

কী খেতে দেওয়া যায় বাচ্চাটাকে, যাতে অন্তত খানিকক্ষণের জন্যে বাচ্চাটা চুপ করে? কী আছে হাতের কাছে?

ভাবার জন্যে বেশি সময় নেয়নি কুন্তী। ঘরের কোণায় রাখা কাঠের তাক হাতড়িয়ে বার করে আনে একটা ভারী পিতলের ঝিনুক।

বিনোদের কিনে দেওয়া ঝিনুক। ওর, না না, ওদের অনাগত সন্তানের জন্যে কেনা। আর সব বেচে খেয়েছে কুন্তী। মায়ার টানে এইটা আর বেচতে পারেনি।

স্খলিত পায়ে মদের বোতল থেকে সরাসরি সেই ঝিনুকে মদ ঢালে কুন্তী, তারপর সেই দুই মাসের শিশুটির ঠোঁট ফাঁক করে তার গলায় ঢেলে দেয় সেই অমৃতধারা। পরে আরও এক ঝিনুক।

চুপ করে বাচ্চাটা। যাক, খানিকক্ষণের জন্যে নিশ্চিন্ত ও, দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে এসে ফের চৌকিতে বসে কুন্তী। আর বসা মাত্র খপ করে তার হাত ধরে ছেলেটা, তার চোখমুখ দেখেই বোঝে কুন্তী, ছেলে আর নিজের বশে নেই। জড়ানো গলায় সে বলে, "বহুত বঢ়িয়াঁ মাল হ্যায় বেব্বি তু। কাল ফির আয়েঙ্গে। আব এক কিসসি দে দে বেবি।"

বিলকুল কামার্ত বিড়ালের স্বর, মুখার্জির বাচ্চাটার মতো। হারামাজাদা মাদারচোদ বঙ্গালি শালা, চুমু খেতে খেতে ভাবে কুন্তী। মালটা ওকে বিয়ে করে নিয়ে তুলেছিল বেলেঘাটার এক বস্তিতে। তখন কী তোয়াজ তার, বাব্বা! মাঝে মাঝে ভুল হয়ে যেত কুন্তীর, সে কি স্বর্গে আছে নাকি? এত সুখ লেখা ছিল তার কপালে, মাগো মা! আকৈশোরের সেই অধরা স্বপ্ন কি সত্যি এবার সফল হতে চলেছে তার জীবনে? প্রথমবার তো...

প্রথমবারের কথা ভাবতেই ফের চোখে মুখে রক্ত উঠে আসে কুন্তীর। তখনই বোঝা উচিত ছিল তার, এত সুখ ঈশ্বর

লিখে দেননি তার কপালে।

যেদিন ও আর বিনোদ পালায় মহল্লা ছেড়ে, তার তিনদিন পরেই ভাগলপুরে শুরু হয়ে যায় দাঙ্গা। সেই তালেগোলে তাদের পালাতে যে সুবিধাই হয়েছিল সে কথা অস্বীকার করতে পারে না কুন্তী। পরের একটা মাস স্বপ্নের মতোই কেটে গেছিল ওর। বিনোদই ওকে ভরতি করে দেয় ট্যাংরার দিকে একটা নার্সিংহোমে, টাকা জুগিয়েছিল তুকারামের গল্লা ভেঙে আনা কাঁচা ক্যাশ। যেদিন ওর বাচ্চা হয় সেদিন আনন্দে কেঁদে ভাসিয়েছিল কুন্তী, এখনও মনে আছে। ভাবতে ভাবতে পরের গ্লাসটা বানাতে বানাতে হাত কেঁপে যায় কুন্তীর।

ছেলে হয়েছিল ওর, তাগড়া একটা বেটা। বাচ্চা হওয়ার দু-দিন বাদে ঘরে ফেরে ওরা, মানে ও আর বিনোদ। তখন ওরা উঠে এসেছে উলটোডাঙ্গার পিছনে এক বিহারি বস্তিতে। ওখানে না থাকলেই হয়তো ভালো হত, এখন ভাবে কুন্তী। নিশ্চয়ই ওদেরই কোনো দেশোয়ালি ভাই ওদের খবরটা সিওয়ান তক পৌঁছে দিতে কসুর করেনি।

তারপর যা হয়, ওরা দলবল নিয়েই এসেছিল। শুক্লাজি নিজে, তারপর বিজেন্দর, ঘনশ্যাম, ছুটনিয়া আরও অনেকে। বিনোদকে তুলে নিয়ে যেতে ওদের কোনই অসুবিধা হয়নি। কুন্তীর পাগলের মতো হাঁচোরপাঁচোর, এর ওর পা জড়িয়ে কাকুতিমিনতি, বুক ফাটিয়ে কান্না, কিছুতেই কিছু হয়নি। বিনোদকে তুলে নিয়ে গেছিল ওরা। আর নিয়ে গেছিল ওদের বাচ্চাটাকেও, হাজার হোক খানদানের লহু বলে কথা!

সেদিনটার কথা ভেবে অনেক চোখের জল ফেলেছে ও। আজকাল আর ওর কান্না-টান্না কিছু আসে না। বিনোদ কেন ফিরে আসেনি এ নিয়ে পরে অনেক ভেবেছে ও। কী জানি, হয়তো পরে ফিরে এসেছিল, তখন কি আর কুন্তী পড়ে আছে সেই বস্তিতে? অকেলা বেসাহারা অওরতের চোখের জল

মোছাবার মতন হাত কম আছে নাকি কলকাত্তা শহরে? সেই অগণিত হাতেরই কেউ একটা তাকে সযত্নে তুলে নিয়ে আসে সোনাগাছিতে। এ ছাড়া আর কীই বা করত কুন্তী? শালি পেট বড়ি কুত্তি চিজ হ্যায়, আর সব ভুললেও এইটা ভোলার উপায় থাকে না যে!

এই কথাটা পরে আর একবারই ভুলতে চেয়েছিল কুন্তী, এই মাঝবয়সে এসে ফের মা হওয়ার, সংসার করার শখটা চাগাড় দিয়েছিল তার, ওই শালা মুখার্জির বাচ্চাটার কথা শুনে। সেই ভুলের মাশুল কড়ায় গণ্ডায় চোকাচ্ছে সে এখন। বাচ্চাটা জন্মাবার দিনই খবরটা পায় কুন্তী। তার নার্সিংহোমে (জোর করে কুন্তীকে নার্সিংহোমেই ভরতি করেছিল হারামিটা) থাকার সুযোগ নিয়ে কুন্তীর জমানো গয়না, টাকাকড়ি নিয়ে ভেগেছে তার রসিক বাঙালি নাগর। ব্যাংকে টাকা জমানোর কথা কোনোদিন ভাবেইনি সে। ফলে আজ সে সেই একই জায়গায় যেখানে বিশ সাল পহলে এক অভিশপ্ত দুপুরে সে দাঁড়িয়েছিল উলটোডাঙার পেছনের বিহারি বস্তিতে।

কপর্দকশূন্য অবস্থায়।

বাচ্চা কোলে আধবুড়ি বেশ্যাকে আর ফিরিয়ে নেয়নি সোনাগাছি। শেষে অনেক বলে কয়ে এই আসানসোলের মতো আধা বঙ্গালি আধা বিহারি শহরের রেলবস্তিতে থাকতে আসা।

ততক্ষণে উঠে দাঁড়ায় ছেলেটা, আঠেরো-উনিশ বছরের সেই দীর্ঘ, পেটাই ঋজু দেহ মদের ঝোঁকে টলতে থাকে। তারপর পকেট দোমড়ানো-মোচড়ানো দুটো পঞ্চাশ টাকার নোট বার করে কুন্তীর কাঁচুলির ভাঁজে গুঁজে দেয়, ঈষৎ স্খলিত গলায় বলে, "তেরা টিপস।" তারপর জামাটা পরার বদলে হাতে নিয়ে ঘুরে দাঁড়ায় ছেলেটা, টলতে টলতে এগোতে থাকে দরজার দিকে।

আর তখনই দাগটা চোখে পড়ে কুন্তীর, ঘরের মধ্যে

ষাট ওয়াটের বাল্‌বের সামান্য আলোতেও দাগটা চিনতে ভুল হয় না তার। ছেলেটার ডান কাঁধে গাঢ় বাদামি রঙের একটা এবড়োখেবড়ো দাগ, প্রায় ভারতবর্ষের ম্যাপের মতন।

জন্মদাগ।

এই দাগটা চেনে কুন্তী, খুব ভালো করেই। যে ক-টা দিন নিজের প্রথম স্নেহের পুত্তলিটি নিয়ে স্বর্গসুখের খেলায় মেতেছিল সে, তখনই কুন্তী খেয়াল করেছিল এটা। ছেলের ডানদিকের কাঁধে ভারতের ম্যাপের মতন একটা ছোট্ট বাদামি ছোপ। দুনিয়াতে আর অন্য কিছু ভুলতে পারে কুন্তী, কিন্তু এই দাগটা সে মরে গেলেও ভুলতে পারবে না, কিছুতেই না!

আর সেই দাগের মালিক, আঠেরো-উনিশ বছরের ছেলেটা পেরিয়ে যাচ্ছিল বস্তিবাড়িত অন্ধকার গলি। সেদিকে তাকিয়ে থাকতেই কথাটা কে যেন হঠাৎ করে তার চৈতন্যে জ্বলন্ত শাবলের মতোই গেঁথে দিল। নিজের আত্মজের সঙ্গে শুয়েছে কুন্তী, এইমাত্র। পয়সার বিনিময়ে।

তীব্র নেশার বিষের প্রভাবেই হোক, বা নিজের ছেলের সঙ্গে শোওয়ার গ্লানিতেই হোক, ভিতরটা গুলিয়ে উঠছিল কুন্তীর। একটা অন্ধ ক্রোধ তার তলপেট থেকে উঠে ব্রহ্মরন্ধ্র অবধি জ্বালিয়ে দিতে চাইছিল।

কতক্ষণ একই ভাবে বসে ছিল সে জানে না কুন্তী। চটকা ভাঙে দরজায় ঠকঠক শুনে, সঙ্গে মওসির গলা, "নয়া কাস্টমার আয়া হ্যায় রে, পানসো রুপেয়া দেগা বোল রাহা হ্যায়। মেরা খরচা অলগ, ঝটপট তৈয়ার হো লে রে বাবু।"

উঠে দাঁড়ায় কুন্তী। মেঝে থেকে শাড়িটা কুড়িয়ে নিয়ে পরে। চোখে কাজল দেয়, ঠোঁটে সস্তা লিপস্টিক। খানিকক্ষণ স্থির হয়ে নিজেকে দেখে। তারপর দরজা খুলতে যাওয়ার আগে হঠাৎ করে ওর বাচ্চাটার কথা মনে পড়ে। অনেকক্ষণ থেকে টুঁ শব্দটা নেই যে!

দ্রুত পায়ে গিয়ে কাঁথাটা সরায় ও। নাহ, ঘুমিয়ে পড়েছে বাচ্চাটা।

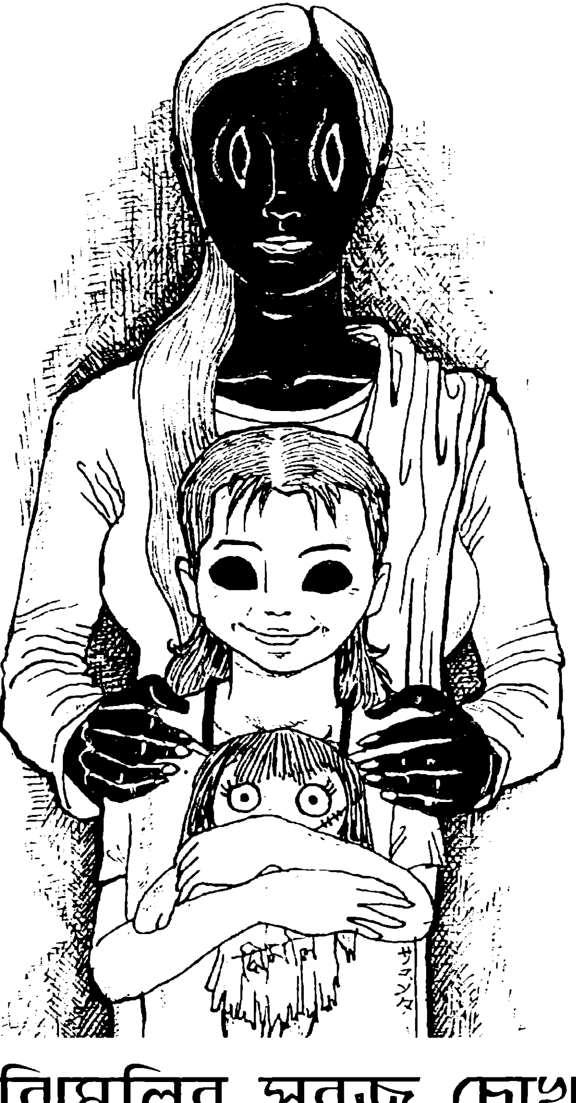
কিন্তু ঘুমিয়ে পড়লে বুক ওঠানামা করছে না কেন? সন্তর্পণে বাচ্চাটার বুকে হাত রাখে ও, কিন্তু কোনো কিছুর স্পন্দন টের পায় না যে! দ্রুত কান পাতে বুকে, নাহ্, কোথায় সেই ক্ষীণ লাবডুব শব্দ? নাকে হাত দেয়, নিশ্বাসের চিহ্নমাত্র নেই। পাগলের মতো ঠান্ডা হয়ে আসা শরীরটা ঝাঁকাতে থাকে কুন্তী, হতে পারে না, এ হতে পারে না। দুটো জোরে থাপ্পড় মারে গালে, যদি ওঁয়া ওঁয়া একবার কেঁদে ওঠে বাচ্চাটা।

না, নেই। কোনো সাড়াশব্দ নেই। ব্যাটারির অ্যাসিড মেশানো লছমির ফুটুশ সাপের বিষের তীব্রতা চিরকালের মতো ঘুম পাড়িয়ে দিয়েছে বুভুক্ষু শিশুটিকে।

ষাট ওয়াট বাল্বের গাঢ় অন্ধকারের মধ্যে স্থাণু হয়ে বসে থাকে কুন্তী। আহা রে, খেতেই তো চেয়েছিল মেয়েটা।

ধীরে ধীরে কাঁথাটা দিয়ে ছোট্ট শরীরটাকে ঢেকে ফেলে কুন্তী। তারপর ক্লান্ত পায়ে আয়নার সামনে দাঁড়ায়। বেশবাস ঠিক করে নেয় সেই আধবুড়ি বেশ্যা মেয়েটা। তারপর দরজা খুলে দাঁড়িয়ে থাকা কাস্টমারকে হাসিমুখে আপ্যায়ন করে ডেকে নেয় ভেতরে, তারপর শেকল তুলে বন্ধ করে দেয় দরজাটা।

বাচ্চাটাকে শমশান ঘাটে জ্বালাতে গেলেও তো পাঁচশোটা টাকা লাগে, না কি?



ঝিমলির সবুজ চোখ

বরাদ্দ মাংসটা ব্যাগে নিয়ে বেরিয়ে আসার সঙ্গে সঙ্গে এমনিই একটু শীত করে উঠল ভজনের। এমনিতেই হেমন্তের শেষ, শীত আসি আসি করছে, ফলে শীত না করার কোনো কারণ নেই। তবে কিনা আধঘণ্টা আগেও একবার বেরিয়েছিল ভজন, তখন কিন্তু এত ঠান্ডা ছিল না।

ছেঁড়া শালখানা আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে ব্যাগের মধ্যে মাংসের টুকরোটা জড়িয়ে বগলের দিকে চেপে রাখল ও। পাক, একটু ওম পাক ব্যাটা। সিদ্ধ হতে সুবিধাই হবে। এটার সুরুয়া নাকি তন্দুরই বেস্ট হবে হরিয়ার হাতরুটির সঙ্গে? দোনামনা করতে করতে নিজের মনেই সুরুয়ার ওপর ভোট দিয়ে ফেলে ও।

হরিয়ার দোকান সামনেই, ফাঁকাই ছিল আজ। "কী বে চুতিয়ে, তোর দুকান বিলকুল ফাঁকা দেখছি যে আজ?" বলে হরিয়ার দোকানের সামনে রাখা বয়াম খুলে একটা বাসি নিমকি তুলে চিবোতে থাকে ভজন। আড়চোখে সেদিকে তাকায় হরিয়া, মনে মনে খিস্তি করে একটা। এই শুয়োরের বাচ্চা খোট্টাটা ব্যাবসা দেয় বটে, তবে ওর খাল খিঁচে নেয় এইভাবেই। ভেবেই মেজাজটা ফের টকে যায় হরিয়ার। এমনিতেই শীতের সময় একঝটকায় কাস্টমার প্রায় আদ্ধেক হয়ে যায়। তার ওপর দোকানের এটা সেটা ফ্রি-তে খেয়ে গেলে কারই বা ভালোলাগে?

"ভালো মাল পেয়েছিস কিছু আজ?" বিরসবদনে রুটি সেঁকতে সেঁকতে প্রশ্ন করে হরিয়া।

"হ্যাঁ বে, বিলকুল চুজ্জা মাল পেয়েছি একটা। একেবারে টাটকা।" বলেই কী একটা ভেবে ফিক করে হেসে ফেলে ভজন।

"হাসছিস কেন বে?" কীসের যেন একটা গন্ধ পায় হরিয়া, "ঘরে মেয়ে-ফেয়ে আনছিস নাকি আজ?" বলেই গলাটা নীচু করে, "আসব নাকি? পাঁচশোর পাত্তি চলবে তো?"

"চল ফোট বে ভিখারি কে অওলাদ," খিস্তি করে ভজন, "গাঁড় ধোনে কা পানি নেহি, চুতিয়া চলে গঙ্গা নাহানে।" সামান্য টলতে টলতে খিস্তিটা দিয়ে ফেলেই বেশ ফ্রেশ ফিল করে ভজন। বাংলুর নেশাটা ভালোই চড়েছে তাহলে। ভালো দেশি দারুতে তামার পয়সা ঘষে আর ঝুল মিশিয়ে এই ইসপেসাল মালটা তৈরি করে ভজন। এর এক এক গেলাসে অনেক রথী মহারথীকে জমিন ধরিয়েছে ভজন।

আজ দোকানে মুরগিটা আসা মাত্তর পছন্দ হয়ে গেছিল ভজনের। অ্যাসিস্ট্যান্ট রহমানকে বলেছিল মালটা ভালো করে ড্রেসিং করে রাখতে, যেন অন্য কাস্টমারকে পয়সা দেখে গছিয়ে না দেয়। শুয়োরের বাচ্চাটা একনম্বরের হারামি, আগেরবার এরকমই ভজনের দেখে রাখা একটা ভালো মুরগা খদ্দের দেখে বেচে দিয়েছিল। সেই রাতে খানকির ছেলেটাকে ল্যাংটো করে বেল্ট দিয়ে চাবকেছিল ভজন। শালা বসের কথা শুনবি না কাস্টমারের?

হরিয়া একটা কাগজের ঠোঙায় চারটে রুটি প্যাক করে দেয়, হাতে তুলে দেওয়ার সময় বেজার মুখে বলে "আড়াইশো টাকা হল তোর। এবার অন্তত একটা পঞ্চাশের পাত্তি ছাড়।"

ফের খিস্তি করে ভজুয়া, "পালিয়ে যাচ্ছি না কি বে?

শালা যার সোঙ্গে কোথা বোলি শুধু টাকা টাকা টাকা...” বলেই হরিয়ার দিকে সরু চোখে তাকায় সে।

সেই চোখের দিকে একবার তাকিয়ে চুপ করে যায় হরিয়া, চোখ সরিয়ে নেয় সে।

ভজন যে মারপিট খুনখারাপি করে তা নয়, সে এমন কিছু লম্বাচওড়া লোকও নয়। কম কথা বলা ঠান্ডা মাথার লোক সে। এক হরিয়া আর রহমান ছাড়া কারও সঙ্গে তার বিশেষ সখ্য নেই। যত চোটপাট খিস্তিখেউড় এদের ওপরেই। তা ছাড়া সারাদিন চুপচাপ নিজের কাজের জায়গায় বসে থাকে সে। লোকজন আসে, ঠান্ডা উদাসীন মুখে কাজকম্ম সারে সে। তারপর বরাদ্দ মাংসের খণ্ডটা নিয়ে বেরিয়ে পড়ে। চেঁচামেচি ঝগড়াঝাঁটি খুব একটা করে না, বিরক্ত হলে একটাই কাজ করে ভজন। অপলক চোখে সোজা তাকিয়ে থাকে সামনের দিকে। ঠিক একটা ফণা তোলা কেউটের মতো।

ওই ঠান্ডা চোখ দুটোর মধ্যে এমন কিছু একটা আছে যে সেদিকে বেশিক্ষণ তাকিয়ে থাকলে লোকের অস্বস্তি হতে থাকে। মনে হয় যেন শিরদাঁড়ায় গুঁড়ো গুঁড়ো বরফ পড়ছে যেন। লোকের মাথার মধ্যে অজান্তেই একটা ভয় চারিয়ে যেতে থাকে। অজানা এক ভয়।

ভজনকে লোকে ভয় পায়, খুব ভয় পায়। ভজনের চোখের রং সবুজ।

ভাঙা ল্যামব্রেটা স্কুটারটা কাত করে নেয় ভজন, তারপর কিক মেরে স্টার্ট করার চেষ্টা করে। এ বহুত পুরোনো মাল, ভজনের বাবা যখন এখানে চাকরি করত তখনকার। বুড়ি

হলে কী হবে, জওয়ানি যায় যায় করেও যায়নি শালির। দু-বার ফলস মারার পর দাঁত চিপে একটা খিস্তি করে ভজন। খুব সম্ভবত সেই অশ্রাব্য খিস্তিটা শুনেই তিনবারের বার চালু হয়ে যায় ইঞ্জিন। পায়ের কাছে একটা ছোটো মতো ক্যারিয়ার বানানো আছে, মাংসের ব্যাগটা সেখানে রেখে ভুটভুট আওয়াজ তুলে বেরিয়ে যায় সে।

এই এলাকায় এমনিতেই লোকজন খুব একটা আসে না, তার ওপর শীতের শুরুয়াত। একটু একটু করে কুয়াশা নেমে আসছে রাস্তার ওপর। রাস্তা বিলকুল ফাঁকা। গলি থেকে মিনিট দুয়েক স্কুটার চালালে বড়ো রাস্তা শুরু। মোড়ের মাথার সর্দারজির টায়ার টিউবের দোকানটা সচরাচর রাত দশটা অবধি খোলা থাকে, আজ সেটাও বন্ধ। শুধু পাশের লছমনের পানের দোকানটা খোলা ছিল। টেমির টিমটিমে আলোয় দেখা যাচ্ছিল যে চুপচাপ পাথরের মূর্তির মতো বসে আছে লছমন আর ট্রানজিস্টরে গান ভেসে আসছে 'তুম ইতনা জো মুসকুরা রহে হো...'

মাসখানেক আগে লছমনের বউ দুলারি বাচ্চা হতে গিয়ে মরে গেছে। মহিলার চরিত্র নিয়ে বাজারে কম গুজব উড়ত না, যার বেশিরভাগটাই সত্যি। লছমনের ঘরের মধু অবরে-সবরে ভজনও কম চাখেনি। শেষবারেও তো... আহা... মালটা তোফা ছিল... ভেবেই শীতের মধ্যেও চেগে উঠল ভজন। যেমন নরম তেমনই রসালো ছিল বটে দুলারি।

শীতের রাতে স্যাঁতসেঁতে হাই রোড ভজনের স্কুটারে চাকার নীচে সাঁইসাঁই পিছলে যাচ্ছে ক্ষুর ধার দেওয়ার চামড়ার বেল্টের মতো। রাস্তার দু-পাশের ফসলকাটা জমি

বাঁজা মেয়েমানুষের ফাঁকা কোলের মতো এলিয়ে শুয়ে আছে। থেকে থেকে একটা ঠান্ডা হাওয়ার ঝলক এসে হাড় কাঁপিয়ে দিচ্ছিল ভজনের, বাংলুর ওমটা কমে আসছিল তার। চারিদিকে অন্ধকার রাত নেমে এসেছে কালো চাদরের মতো। ভজনের স্কুটারের আলোটা মরা মানুষের ঘোলাটে হলদে চোখের মতো রাস্তার ওপর ছলকে ছলকে উঠছিল। রাস্তায় দূর দূর অবধি মানুষ কেন, একটা প্রাণীর চিহ্নমাত্র নেই। সচরাচর এসময় এই রাস্তা কাঁপিয়ে মস্ত মস্ত পাঞ্জাব লরি ছুটে যায়। কিন্তু আজ তাদেরও চিহ্নমাত্র নেই। দু-ধারে ঠান্ডা কালো আকাশ নেমে এসেছে দিগন্ত জুড়ে, আকাশে উজাগর হয়ে রয়েছে কালপুরুষ। তারই মধ্যে ঘটঘট শব্দ করে তারার আলোয় পথ চিনে চিনে চলছিল ভজনের স্কুটার।

হালকা একটা শিস দিতে দিতে স্কুটার চালাচ্ছিল ভজন। প্রায় অর্ধেক রাস্তা চলে এসেছে ও। সামনে ফাঁসিবটের মোড়। মোড়টা পেরিয়ে জংলাবুড়ির বিল, তার পাশের আলপথ বেয়ে স্কুটার চালালেই আর মিনিট পঁচিশেকের রাস্তার পর ওর বাড়ি।

মনটা প্রফুল্ল হয়েছিল ভজনের, খুব সম্ভবত বহুদিন বাদে এমন চুজ্জা মুরগি পাওয়ার জন্যই হয়তো। সেই প্রফুল্লতায় ডুবে থাকার জন্যই হঠাৎই কোথা থেকে যেন ক্যাঁওওওও আওয়াজ পেয়ে জোর চমকে যায় সে। ক্যাঁঅ্যাঅ্যাঅ্যাচ করে সজোরে ব্রেক কষে ভজন। আওয়াজটা যেন পাশের কালভার্টের নীচ থেকে আসছে কি?

মুহূর্ত খানেকের পরেই ব্যাপারটা বুঝতে পারে ভজন। আওয়াজটা ওর চাকার তলা থেকেই আসছে।

স্কুটারটা দাঁড় করিয়ে একটু ঝুঁকে দেখল ভজন। কী একটা যেন ওর চাকার তলায় ছটফট করছে। দ্রুত স্কুটারটা

পিছিয়ে আনে সে। তারপর স্ট্যান্ড লাগিয়ে উবু হয়ে দেখার চেষ্টা করে কেসটা কী।

একটা বেড়ালের বাচ্চা। ওর স্কুটারের নীচে চাপা পড়েছে।

কেমন যেন একটু হতভম্ব হয়ে যায় ভজন। যতই অন্ধকার হোক, একটা বেড়াল বাচ্চা রাস্তা পেরিয়ে ওর গাড়ির চাকার তলা অবধি চলে এল, আর সেটা ওর নজরে পড়ল না? চোখ দুটোর মাথা খেয়েছে নাকি ও? আর-একটু নীচু হল ভজন। আর এইবার নজরে না পড়ার কারণটা নজরে এল ওর।

বেড়াল বাচ্চাটা কালো। কালো মানে কুচকুচে কালো। এমন কালো বিড়াল জন্মে দেখেনি ভজন। তবে যেটা দেখে একটু থমকে গেল ও সেটা হচ্ছে বিড়ালটার চোখ।

বিড়ালটার চোখ সবুজ। ঘন সবুজ। ওর চোখের মতেই।

সেই অন্ধকার রাতে ক্ষীণ তারার আলোয় জীবনে প্রথমবারের জন্য গা-টা শিরশির করে উঠল ভজনের। তখনও দাঁত খিঁচিয়ে খাবি খাচ্ছিল বেড়ালের বাচ্চাটা। সামনের থাবা দুটো থরথর করে কাঁপছিল ওর, আর গাঢ় সবুজ চোখ দুটো মেলে চেয়ে ছিল ভজনের দিকে।

ভজনকে কিছু কি বলতে চাইছিল বেড়ালছানাটা?

মাথাটা একবার ঝাঁকিয়ে নেয় ভজন। আজকে মালটা একটু বেশি হয়ে গেছে মনে হচ্ছে। নইলে এসব বেফালতু ভাবনাচিন্তা ওর মগজে আসার কথাই নয়। বেড়াল মানে বিল্লি, আর কালো বেড়াল মানে কালি বিল্লি। মালের নেশা ছাড়া এই

ছটফটানো কালি বিল্লি দেখে ওর এত বিচলিত হওয়ার আর কোনো কারণ থাকতে পারে নাকি?

সোজা হয়ে দাঁড়ায় ভজন। তারপর জুতোর ডগা দিয়ে দলা হয়ে যাওয়া বেড়াল বাচ্চার দেহটা ফুটবলের মতোই দূরে ছুড়ে দেয় ও। ফালতু ঝঞ্ঝাট যত। এসব চুদুরবুদুরে আটকে না গেলে এতক্ষণে বাড়ির কাছাকাছি চলে যাওয়ার কথা ওর।

স্কুটারের ক্যারিয়ারে একটা জলের বোতল রাখাই থাকে ভজনের। সেটা বার করে জুতোর ডগাটা ধুয়ে নেয় ও। কুলকুল করে রক্ত ধোওয়া কালো জলের স্রোত রাস্তার ওপর দিয়ে বয়ে যায় । দেখে মনে হয় কেউ যেন পেচ্ছাপ করেছে ওখানে। হি হি করে হাসে ভজন। তারপর ওর মনে পড়ে যে ওরও পেচ্ছাপের বেগ পেয়েছে প্রবল। রাস্তার মধ্যিখানে স্কুটারটা দাঁড় করিয়ে আলের ধার ঘেঁষে দাঁড়িয়ে প্যান্টের চেনটা খোলে সে।

শেষ হয়েছে কাজ, চেনটা টেনে বন্ধ করবে ভজন, ঠিক এমন সময় একটা কান্না শুনে ঘাড়ের রোঁয়া দাঁড়িয়ে গেল ওর।

এখান থেকে ঠিক একটু দূরে একটা মা বেড়ালের কান্নার শব্দ ভেসে এল না? কে যেন ইনিয়েবিনিয়ে সেই খোলা মাঠে কেঁদে বেড়াচ্ছে?

গা-টা শিরশির করে উঠল ভজনের। চেনটা টেনে দ্রুত স্কুটারে চেপে বসে কিক মারল ও। ওর মন বলছিল যে এখানে যেটা ঘটছে সেটা একদম ঠিক নয়। একদম নয়।

স্কুটারটা ফুল স্পিডে ছোটাচ্ছিল ভজন, যত তাড়াতাড়ি সম্ভব বাড়ি ফিরতে হবে ওকে। জংলাবুড়ির বিলের পাশের রাস্তা ধরে প্রায় উড়েই যাচ্ছিল ওর স্কুটারটা। ডানপাশ থেকে বিলের জল ছুঁয়ে আসা ঠান্ডা হাওয়া ওর কপালের ঘামের

ফোঁটায় খিলখিল করে হেসে উঠছিল যেন। শিরশিরানিটা আরও জমে যাচ্ছিল ওর বুকের মধ্যে।

বিলটা শেষ হয়ে এসেছে প্রায়, কুয়াশা আরও ঘন হয়ে এসেছে, এমন সময় হঠাৎ প্রতিবর্ত ক্রিয়াতেই ক্যাঁঅ্যাঅ্যাঅ্যাচ করে ব্রেক কষতে বাধ্য হল ভজন।

বাঁদিক থেকে ডানদিকে রাস্তা পার হচ্ছে একটি যুবতী মেয়ে। সে তার ডান হাতে একটি বাচ্চা মেয়ের হাত ধরে আছে। বাচ্চাটার ডান হাতে আবার পুতুল-টুতুল কিছু একটা হবে, বুকের কাছে জড়িয়ে ধরে আছে। রাস্তার প্রায় মাঝখানে চলে এসেছিল দুজনে, আর-একটু হলেই ভজন ওদের ওপর ভিড়িয়ে দিচ্ছিল প্রায়। স্কুটারের চাকাটা একটু স্কিড করে যেতে খিস্তি দিয়ে চেঁচিয়ে ওঠে ভজন।

আর বোধহয় সেই শুনেই ডানদিকে ঘাড়টা ঘুরিয়ে তাকাল মেয়েটি। সেইদিকে তাকিয়ে পাথর হয়ে যায় ভজন।

এমন বীভৎস কুচকুচে কালো রং যে কোনো মানুষের গায়ের হতে পারে সে কোনোদিনও ভাবেনি ভজন। তার মনে হল কেউ যেন একদলা পিচ পিটিয়ে পিটিয়ে তৈরি করেছে এই মেয়েটার শরীর। মাথার মধ্যে সেই পিচের দলা পেটানোর শব্দটাও শুনতে পাচ্ছিল ভজন। যেটুকু তারার আলো চুঁইয়ে পড়ছিল আকাশ থেকে, সেসব শুষে নিচ্ছিল মেয়েটির অবয়ব। তবে তাতেও ভয় পায়নি ভজন, ভয় পেল যেটা দেখে সেটা হচ্ছে মেয়েটার চোখ দুটো।

মেয়েটার চোখের জায়গায় চোখ আছে বটে, কিন্তু সে দুটো মাটির সমান্তরাল নয়।

সে দুটো লম্বালম্বি বসানো!

আর কপাল থেকে গাল অবধি নেমে আসা সেই চোখের ভেতর দুটো খালি! একেবারে খালি!

ভেতরে ভেতরে কাঁপুনি শুরু হয়ে গেছিল ভজনের। সেইদিকে অপলক চোখে তাকিয়ে ছিল সে। তার মধ্যেই বাচ্চা মেয়েটাও ডানদিকে ঘাড় ঘুরিয়ে তাকাল তার দিকে।

আর কেন জানি না ভজনের মনে হল যে ঘাড়টা ঘুরল না, শুধু মাথাটা এদিকে ঘুরে গেল! বাচ্চাটার চোখ দুটো অবশ্য ঠিকঠাকই ছিল, কিন্তু সে দুটোর ভেতরেও একমুঠো অথই অন্ধকার ছাড়া আর কিছুই দেখতে পেল না ভজন।

যেতে যেতে দাঁড়িয়ে পড়ল বাচ্চাটা, আর তারপর তার ফেটে যাওয়া রক্তমাখা ঠোঁট দুটো হাসির ভঙ্গিমায় দু-দিকে বেঁকে গেল। বাচ্চাটা হাসছে!

সেই হাসি যেন ঠান্ডা করে দিল ভজনের প্রতিটা রক্তবিন্দু। থরথর করে কাঁপছিল তার হাত-পা। বিন্দু বিন্দু ঘাম নেমে আসছিল সারা শরীর জুড়ে। বুকের মধ্যে হাপর টানছিল কেউ আর হাজার ড্রাম বাজছিল। আর তাকিয়ে থাকতে পারল না ভজন, চোখের পাতা দুটো ভারী হয়ে নেমে এল ওর।

ভজনের মনে নেই কতক্ষণ চোখ দুটো বুজেছিল সে। কিছু পরে চোখ খোলে ভজন।

কেউ নেই। কেউ কোথাও নেই।

কাঁপা কাঁপা হাতে পকেট থেকে রুমাল বার করে ঘাম মোছে ভজন। বুঝতে পারে যে রগের শিরা দপদপ করছে তার। কান দুটো গরম হয়ে আছে আগুনের মতো। বুকের ভেতর ড্রাম পেটানোর আওয়াজটা তখনও কমেনি তার। হাত-পা তখনও একটু একটু কাঁপছে। কোনোমতে জলের বোতলটা তুলে মুখে চোখে জলের ঝাপটা দেয় ভজন।

ঠান্ডা জলের ঝাপটায় খানিকটা প্রকৃতিস্থ লাগে তার। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েই কিছুক্ষণ বিড়বিড় করে ভজন, তারপর নিজের গালে নিজেই দুটো থাপ্পড় মারে। নাহ, এত নেশা আর কখনোই করবে না ভজন। ঘাট হয়েছে তার। টাটকা লিভার ফ্রাইয়ের লোভে লোভে ফুল বোতল খালি করে দেওয়াটা একদমই উচিত হয়নি। তার ওপর কী যেন একটা ফুঁকছিল আজ?

আহ, এইবার বুঝল ভজন। রহমান ওর কোনো দেশোয়ালি ভাইয়ার কাছ থেকে ভালো কোয়ালিটির গাঁজা গেঁড়িয়েছিল কিছু। দুটো মিলেমিশেই আজ এই অবস্থা। সেই জন্যই চোখে এইসব ভুলভাল দেখছে ও।

নিজেকে বোঝালো বটে ভজন, কিন্তু কোথাও যেন একটা ধন্ধ তার মনের মধ্যে কাঁটার মতো খচখচ করতে লাগল।

বাচ্চা মেয়েটাকে খুব চেনা চেনা লাগছিল ভজনের। কোথায় যেন দেখেছে ও?

গাড়ি চালাতে চালাতে ভাবছিল ভজন। কোথায় যেন সদ্য দেখেছে বাচ্চাটাকে? নেশার ঘোরে স্মৃতিটা একটু এলোমেলো হয়ে যাচ্ছিল তার। মুখটা তাকে বিব্রত করছিল খুব। ভজন কোথায় দেখেছে এই মুখ?

বাড়ির সামনে স্কুটারটা স্ট্যান্ড করার সময়েও কথাটা ভাবছিল ভজন। অস্বস্তিটা ক্রমশই বেড়ে উঠছিল তার। কোথায় যেন... কোথায় যেন... কোথায় যেন...

পাড়ার এককোণে একটা নতুন চারতলা বিল্ডিং, তার একতলাটা ভাড়া করে থাকে ভজন। বাকি বিল্ডিং-এর

পুরোটাই ফাঁকা। অন্য ফ্লোরে কেউ আসেনি এখনও। তবে সেসব নিয়ে বিশেষ চিন্তা করে না ভজন। চিরকালই নির্জন নিরিবিলি পছন্দ করে এসেছে ও, তাতে ওর কাজের সুবিধাই হয়। স্কুটারটা স্ট্যান্ড করায় দরজার সামনে। তারপর চাবি দিয়ে দরজা খোলে ভজন। পাল্লা দুটো হাট করে খুলে যায় আর, ঠিক সেই সময়েই মেঝের ওপর পড়ে থাকা জিনিসটা নজরে পড়ে ওর। ওটা আবার কী?

টলতে টলতে ঘরে ঢোকে ভজন। ঝুঁকে পড়ে জিনিসটা তুলে নেয়।

জিনিসটা একটা পুতুল, আরও ভালো করে বলতে গেলে একটা মেয়ে পুতুল। বাচ্চারা যেমন পুতুল নিয়ে খেলে তেমনই আর কী। বাঁহাতে পুতুলটা নিয়ে সেটাকে খুঁটিয়ে দেখতে দেখতে ডানহাতে লাইটের সুইচ অন করে ভজন। মাথার ওপর একটা ষাট পাওয়ারের বাল্‌ব ক্লান্তভাবে দুলতে থাকে। অন্যমনস্ক ভাবে সেটা নিয়ে কিচেনে ঢোকে ভজন। তারপর ভালোভাবে দেখতে থাকে।

পুতুলটা কাপড়ের তৈরি, প্রায় আধহাত লম্বা। বুকের জামাটার ওপর বাচ্চাদের হাতের লেখায় বড়ো বড়ো করে ডটপেনের কালিতে লেখা 'ঝিমলি'। তাতে পুতুলটাকে কিউট দেখানোর কথা, এখন ভীষণ নোংরা দেখাচ্ছে। মনে হয় কে যেন থেঁতলে পিষে কামড়ে বীভৎস অত্যাচার করেছে পুতুলটার ওপর। একটা হাত মোচড়ানো। একটা পা ছিঁড়ে নেওয়া। সারা গায়ে এখানে-ওখানে খোবলানো আর কামড়ানোর দাগ। মাথার একদিকটা ফাটা। মনে হচ্ছে কেউ একটা ডাস্টবিনে ফেলে গেছিল পুতুলটা, আর কুকুর বিড়ালে নিয়ে সেটা নিয়ে কামড়া-কামড়ি করেছে। নোংরা ঘিনঘিনে পুতুলটা দেখে বিরক্ত লাগল ভজনের। কিচেনের জানলাটা খুলল সে, আর তারপর গায়ের সমস্ত জোর দিয়ে যত দূরে সম্ভব ছুড়ে ফেলল পুতুলটাকে।

তারপর জানলাটা বন্ধ করতে যাবে, এমন সময় মনে পড়ল ভজনের, এই যাঃ, মাংসের প্যাকেটটা গাড়িতেই রয়ে গেল যে!

টলতে টলতে সদর দরজা খুলে দু-ধাপ সিঁড়ি নেমে স্কুটারের কাছে এল ভজন। তারপর ঢাকনাটা খুলে ক্যারিয়ারের মধ্যে হাত চালিয়ে দিল সে। খড়মড় করে তার আঙুলগুলো ক্যারিয়ারের চারিদিক ঘুরে চলে এল।

ক্যারিয়ার খালি। কিচ্ছু নেই সেখানে। মাংসের প্যাকেট উধাও!

এইবার মাথাটা গণ্ডগোল হয়ে যায় ভজনের। মাংসের প্যাকেট উধাও হয় কী করে? ঢাকনা দেওয়া ক্যারিয়ার। যতই ঝাঁকুনি লাগুক, সেখান থেকে প্যাকেটটা রাস্তায় পড়ে যেতে পারে না। যেটুকু সময়ের জন্য ভজন বাড়ির ভেতর ঢুকেছিল তার মধ্যে কুকুর বেড়ালের পক্ষেও সেটা নিয়ে যাওয়া অসম্ভ। তাহলে মালটা গেল কোথায়?

প্যান্টের বাঁ পকেটে রামের একটা ছোটো কোয়ার্টার সবসময়ই থাকে ভজনের, বিপদ-আপদের সঙ্গী। এতক্ষণ সেটার কথা মনেই ছিল না ওর। এইবার সেটার কথা মনে পড়াতে বোতলটা বার করে ছিপিটা খুলে পুরো বোতলটা গলায় ঢেলে দেয় ও।

নেশাটা নিভে আসছিল তার। কিন্তু হঠাৎই এই ইন্ধন পেয়ে যেন দাউ দাউ বেগে দ্বিগুণ জ্বলে উঠল তার আচ্ছন্নতা।

কিচেনে থুপথাপ করে ফিরে আসছিল ভজন। মাংসের প্যাকেটটা হাতছাড়া হয়ে যাওয়ায় মাথাটা দাউ দাউ করে জ্বলছিল তার। এবার কী করবে সে? আজকের রাতটা কী করে চলবে তার? তার ওপর তখনও তার অবচেতনে একটা অস্বস্তি অনবরত তাকে খুঁচিয়ে যাচ্ছিলই। বাচ্চাটার মুখ তার

এত চেনা লাগছিল কেন? কোথায় দেখেছে সে এই বাচ্চার মুখ? সেই বেড়াল বাচ্চাটার চোখ এমন সবুজ দেখাচ্ছিল কেন? যে পুতুলটাকে ছুড়ে ফেলে দিল সে, তার চোখই বা...

হাঁটতে হাঁটতে হঠাৎই থেমে গেল ভজন। যেটা তার নেশাগ্রস্ত মাথায় ধরা পড়েনি, সেটা কিন্তু তার সদাসতর্ক অবচেতনে ছাপ ফেলতে ভুল করেনি একেবারেই!

ওই ঝিমলি লেখা পুতুলটার, যেটা কিচেনের বাইরে ছুড়ে ফেলেছে ভজন, তারও চোখদুটো সবুজ। ঘন সবুজ! ঠিক ভজনের মতো!

সেই বেড়াল বাচ্চাটার মতো!

ভজনের স্নায়ু আর নিতে পারছিল না। দেরাজ খুলে একটা আধখাওয়া বাংলার বোতল বার করে আনে সে। তারপর একটা গ্লাসে ঢেলে হাফগ্লাস নিট বাংলু গলায় চালান করে দেয় সে!

মদটা তার গলা জ্বালিয়ে বুকে নামতে নামতেই কিচেনের দিকে হাঁটা দেয় সে। শালা, মালটা রাস্তায় পড়ল কোথায়? আহা, অমন কচি মাংস অনেকদিন জোটেনি ভজনের। আজ ভেবেছিল আয়েশ করে খাবে। একটা ব্যর্থতার রাগ ভেতরে ভেতরে চিতিসাপের বিষের মতো ছড়িয়ে পড়তে থাকে তার মস্তিষ্কের কোশে কোশে।

কিন্তু কিচেনে পৌঁছাতেই চমক! এই তো মাংসের প্যাকেটটা! কিচেন বেডের ওপর!

দেখেই ধক করে একরাশ নিশ্চিত খুশি নেমে আসে ভজনের বুকে। যাক বাবা, অনেকগুলো ঝামেলার হাত থেকে

রেহাই পাওয়া গেল। আজ রাতে আর অন্য কিছু করে খেতে হচ্ছে না! ভজনের মনে হয় খুশিতে এবার নেচেই উঠবে ও। বাপ রে বাপ, কী টেনশনেই না পড়ে গেছিল সে।

ধীরে ধীরে কিচেন বেডের কাছে এসে দাঁড়ায় ভজন। একটা ট্রে এনে রাখে প্যাকেটটার সামনে। তারপর প্যাকেটটার গার্ডার খুলে ভেতরের মাংস খণ্ডগুলো সড়াৎ করে ট্রে-র ওপর এনে ফেলে।

বাহ বাহ, কাট দেখে মুগ্ধ হয়ে যায় ভজন। রহমানটা দিন দিন হারামি হয়ে উঠলে কী হবে, মাংস কাটাটা ভালোই শিখেছে ওর কাছে। গুরুর যোগ্য চ্যালাই বটে।

মাংস কাটার বড়ো চপারটা সবে হাতে নিয়েছে ভজন, এমন সময়ে দপ করে লোডশেডিং হয়ে যায়।

এই শালা এক মুসিবত এই ব্যহেনচোদ টাউনের, চাপা দাঁতে খিস্তি করে ভজন, থেকে থেকে বিজলি চলে যায়। হাতড়ে হাতড়ে কিচেনের ড্রয়ার থেকে মোমবাতিটা বার করে প্রথমে, তারপর পকেট থেকে লাইটারটা বার করে মোমবাতি জ্বালায় সে।

মোমবাতির আলোয় ভূতুড়ে দেখায় ভজনের দীর্ঘ ছায়া। মাথার ঝাঁকড়া চুলগুলো সাপের লেজের মতো উড়তে থাকে। হাতের চপারটা অনাবশ্যক রকমের দীর্ঘ দেখায়। আর সেই ছায়ার মধ্যে দপদপ করতে থাকে তার লাল লাল চোখ দুটো।

ঢুলুঢুলু চোখে খানিকক্ষণ নিজের ছায়ার দিকে চেয়ে থাকে ভজন। বড়ো মোহময় লাগছিল তার নিজের ছায়াছবি। একটা শিরশিরে অনুভূতি ঠান্ডা কেঁচোর মতো তার শিরদাঁড়া বেয়ে বেয়ে নীচের দিকে নামছিল।

চপারটা তুলে নিয়েছিল ভজন, ট্রে-র ওপর রাখা মাংসখণ্ডের ওপর নামিয়ে আনবে। ঠিক তার আগের মুহূর্তে একটা কথা তার মাথায় যেন হঠাৎ হাউইয়ের মতোই জ্বলে

উঠে তাকে হতভম্ব করে দিল।

ছায়ার চোখ জ্বলে কী করে? ছায়ার চোখ থাকে নাকি?

প্রশ্নটা এক লাথি মেরে তার মাথার দরজাটা হাট করে খুলে দেয়। অনেকগুলো প্রশ্ন, যেগুলো এতক্ষণ তার মনের অন্ধকার কোণে ঘাপটি মেরে পড়েছিল সেগুলো হুড়মুড়িয়ে তার মাথার মধ্যে ছায়ার মতো ভিড় করে আসে।

ঘরের দরজাটা বন্ধ থাকা সত্ত্বেও ঘরের মধ্যে পুতুলটা এল কোথা থেকে?

পুতুলটা আজকেই কোথায় একটা দেখল না ভজন? কোথায় দেখল যেন?

মাংসের প্যাকেটটা কিচেনে নিজে নিজে এল কী করে?

সেই বিড়ালছানাটা থেকে শুরু করে বাচ্চা মেয়েটা, মায় এই পুতুলের চোখ অবধি, সবার চোখ অমন সবুজ হয় কী করে?

বাচ্চা মেয়েটাকে কোথায় দেখেছে ভজন? কোথায়?

হাঁ করে নিজের ছায়ার দিকে চেয়েছিল ভজন। তার ছায়ার চোখ দুটো যেন ক্রমশ আগুনে কয়লার মতো জ্বলে উঠছিল, ঠোঁট দুটো বেঁকে গেছিল অর্ধবৃত্তাকারে।

ছায়াটা তার দিকে তাকিয়ে হাসছিল।

হাসছিল সেই বাচ্চা মেয়েটার মতো!

ঠিক সেই সময়েই কিচেন বেডের ওপর পড়ে থাকা মোবাইলটা খড়খড় করে উঠে তাকে চমকে দেয়। স্ক্রিনের দিকে তাকায় ভজন, সেখানে কোনো নাম্বার নেই। কলটা অ্যাক্সেপ্ট করে মোবাইলটা কানে তোলে ভজন। সতর্কভাবে প্রশ্ন করে, "কে?"

ওপারে কিছুক্ষণের নৈঃশব্দ। তারপর লাইন বেয়ে একটা বাচ্চা মেয়ের ধাতব ক্যানক্যানে গলায় খিলখিল হাসি ভেসে এল, "ও আঙ্কেল, আমাকে বাইরে ফেলে দিলে কেন গো?"

ঘাড়ের রোঁয়া দাঁড়িয়ে গেল ভজনের। ফোনটা ঝট করে কেটে দিল সে। তারপর বিস্ফারিত চোখে তাকিয়ে রইল ফোনের দিকে। কার ফোন ওটা? কে কল করল তাকে?

তার আতঙ্কিত চোখের সামনে ফের বেজে উঠল সেই ফোন।

স্ক্রিনে কোনো নাম্বার নেই।

নিজের সমস্ত ইচ্ছার বিরুদ্ধে তার হাত যন্ত্রচালিতের মতো এগিয়ে গেল সামনের মোবাইলের দিকে। কল অ্যাক্সেপ্ট করে ঠান্ডা হাতে মোবাইলটা কানে নেয় সে। কপাল থেকে ঘামের ফোঁটা তার গাল বেয়ে নামতে থাকে।

"কী হল আঙ্কেল, আমার সঙ্গে খেলবে না? দরজাটা খোলো না আঙ্কেল, আমি দরজার বাইরে দাঁড়িয়ে আছে যে।"

দরদর করে ঘামতে থাকে ভজন। সেই ধাতব স্বর যেন তার শরীরের সমস্ত রক্তকণা ঠান্ডা করে দেয়। তার মাথার সমস্ত বোধবুদ্ধি জমে যেতে থাকে মৃত মানুষের বরফ ঠান্ডা ঘিলুর মতো।

ঘোরের মধ্যে হেঁটে হেঁটে দরজার কাছে যায় সে। যন্ত্রের মতো বোধহীন হাতে দরজাটা খোলে সে, দু-হাট করে দেয় পাল্লা।

দরজার বাইরে কেউ নেই। কিছু নেই। হুহু করে হেমন্তের হাওয়া খেলে যায় ভজনের বুকে।

দরজা বন্ধ করে ফের কিচেনে আসে সে। বাংলুর বোতলটা গলায় উপুড় করে দেয় প্রায় আদ্ধেকটা। রোমে রোমে অশ্লীল উত্তাপ ছড়িয়ে পড়ে গোপন পাপের মতো। চপারটা থরথর হাতে ফের তুলে নেয় সে। কিমা করতে হবে

মাংসের টুকরোগুলোকে।

আবার বেজে ওঠে ফোন। তখন বোধহয় ভজনের মস্তিষ্কের সমস্ত কোশগুলো আতঙ্কে আর ভয়ে মৃতপ্রায় হয়ে গেছে। অনুভূতিহীন হাতে মোবাইল তুলে নেয় সে। মোবাইলের ওপার থেকে খিল খিল করে টিনের খেলনার মতো শব্দে হেসে ওঠে কেউ, "ও আঙ্কেল, কোথায় গেলে? আমি তোমার বাড়ির ভেতরেএএএ।"

ফোনটা হাত থেকে পড়ে যায় ভজনের। এদিকে-ওদিকে ছড়িয়ে যায় ফোনের স্ক্রিন আর ব্যাটারি। পাথরের মতো সেদিকে তাকিয়ে থাকে ভজন। তার সাহস হয় না সেগুলো কুড়িয়ে তুলতে। মদের নেশায় চারপাশের সবকিছুই ঝাপসা দেখাচ্ছিল তার কাছে, ছায়া খেলে যাচ্ছিল প্রতিটি বস্তুর চারিপাশে। কিছুই আর স্বাভাবিক মনে হচ্ছিল না তার কাছে। চপারটা কোথায় আছে সেটা নজরে আসেনি তার। পুরো কিচেন বেডটাই শ্মশানের চুল্লির মতো গলে গলে পড়ছিল যেন ভজনের চোখের সামনে।

দৌড়ে দৌড়ে সারা বাড়ি ঘুরতে থাকে ভজন। কোথায় লুকিয়ে আছে শুয়ার কি বাচ্চি! বেডরুমে যায় ভজন। খোলা জানালা থেকে আদ্ধেক জাগা রাতের আলো চুঁইয়ে এসে পড়ছিল বিছানার ওপর। সেই আলোয় ভজন দেখল সেখানে কেউ নেই! সেখান থেকে বাথরুম। বসার ঘর। পিছনের উঠোন। সোফার নীচে। বিছানার নীচে। বাইরের বারান্দা। উঠোনের বাইরের মাঠ।

ভয়ে আর আতঙ্কে বিচলিত ভজন দাঁতের ফাঁক দিয়ে থুতুর মতো খিস্তি ছেটাতে থাকে। থুতু ছেটাতে ছেটাতে সারা ঘর ঘুরে বেড়াতে থাকে প্রেতের মতো। ভয় আর অসহায় ক্রোধ ছড়িয়ে পড়ে সেই অন্ধকার মোমবাতি জ্বলা ঘরের মধ্যে। কোথায় সেই স্বর? কে বারবার কল করছে তাকে? কেন কল

করছে?

ক্লান্ত হয়ে শেষে কিচেনে ফিরে আসে ভজন। ব্যর্থ শিকারি কুকুরের মতো হাঁপাতে থাকে সে। তার মধ্যে মিশে থাকে আতঙ্ক, মিশে থাকে রাগ, মিশে থাকে চোরা ভয়।

ওই তো কিচেন বেডের ওপর মাংসের টুকরোগুলো। পায়ে পায়ে সেদিকে এগিয়ে যায় ভজন। আজ বিকেল থেকে কীসব হচ্ছে তার সঙ্গে? কেন? এতদিন ধরে তো কিছুই হয়নি তার!

মাংসের ট্রে-টার সামনে এসে দাঁড়ায় ভজন। তারপর ডানহাতটা বাড়ায় চপারটার জন্য।

তার হাতটা খালি ঘুরে আসে সেখান থেকে। চপারটা নেই, উধাও।

চপারটা কোথায় গেল, কোথায়? কোথাও ফেলে এল নাকি? খালি জায়গাটার দিকে তাকিয়ে থাকে ভজন। মাথার ভেতরটা খালি হয়ে গেছিল তার।

ঠিক সেই সময় মোবাইলটা ফের বেজে ওঠে মেঝের ওপর থেকে। স্থির চোখে সেদিকে তাকিয়ে থাকে ভজন। মোবাইলটার ব্যাটারি এখনও পড়ে আছে অন্যদিকে। তবুও মোবাইলের নীলাভ স্ক্রিনে ইনকামিং কলের ছবি ভেসে উঠছে, কিন্তু কোনো নাম্বার নেই।

পাথরের মূর্তির মতো নীচু হয়ে মোবাইলটা তোলে ভজন, কল অ্যাক্সেপ্ট করে কানে লাগায় সে।

সেই ধাতব খিলখিল হাসি যেন গরম সিসের মতো ভজনের কানে নেমে আসতে থাকে, "কী গো আঙ্কেল, আমাকে

ঘরে নিয়ে যাবে না? ঘুরে দেখো, আমি তোমার পেছনেই যে!"

ধীরে, অতি ধীরে পেছনে ঘোরে ভজন।

কিচেনের দরজার কাছে দাঁড়িয়ে আছে একটা বাচ্চা মেয়ে। তার বাঁহাতে একটা কাপড়ের পুতুল ধরা, আর ডানহাতে ধরা একটা মাংস কাটার চপার। ভজনের চপারটা।

ডানহাতে চপারটা ধরে, রক্তমাখা ফাটা ঠোঁট দুটো দু-পাশে বাঁকিয়ে হাসতে হাসতে ভজনের দিকে টলটলে পায়ে এগিয়ে আসতে থাকে সেই বাচ্চা মেয়েটা। তার সবুজ চোখ চিনতে ভুল হয় না ভজনের, ভুল হয় না পুতুলটা চিনে নিতে, ভুল হয় ন তার স্কুটারের চাকার নীচে চাপা পড়া বেড়াল বাচ্চাটির চোখের রং চিনে নিতে।

শুধু যেটা দেখে মরণান্তিক ভয়ে স্থির হয়ে যায় ভজন, সেটা হচ্ছে যে এতক্ষণে বাচ্চাটার মুখ মনে পড়ে গেছে তার।

যে রক্তাক্ত মুখের শিশুটি তার দিকে চপার হাতে টলোমলো পায়ে হেঁটে আসছে, সেই এখন বসন্তপুর মর্গের কেয়ারটেকার ভজন দুসাদের বাড়ির কিচেন বেডের ওপর রাখা ট্রেতে শুয়ে আছে খণ্ড খণ্ড মাংসের টুকরো হয়ে!



ও যখন ডাকে

Robert Bloch এর লেখা Enoch গল্পটির অনুবাদ

ব্যাপারটা সচরাচর এইভাবেই আরম্ভ হয়।

প্রথমটা শুরু হয় মাথার ভেতরে কারও একটা হেঁটেচলে বেড়াবার অনুভূতি দিয়ে। মনে হয় কে যেন শীতল ধাতব পায়ে খুলির ওপরে হাঁটছে। ওঠানামাটা শুরু হয় অবশ্য ঘাড়ের কাছ থেকে। তারপর দু-খানা ছোটো ছোটো পা মাথার মধ্যে এদিক থেকে ওদিক চলেফিরে বেড়াতে থাকে। অস্বস্তিটা বাড়তে বাড়তে অসহ্য হলে আমি মাথার চুলগুলো আঁকড়ে ধরে ঝাঁকাতে থাকি। ভাবি এই বুঝি ধরতে পারব ওকে।

কিন্তু না। ও খুব চালাক, আর সেরকমই ধূর্ত ওর গতিবিধি। অনায়াসে আমার মুঠির নাগাল এড়িয়ে ও নেমে আসে আমার ঘাড়ের কাছে।

আর কথা বলে। ফিসফিস করে। আমার কানের মধ্যে।

ভাবছেন আমি মিথ্যে কথা বলছি? আমিও তাই ভাবতাম, যদি না ঘাড়ের কাছে ওর ধারালো নখের আঁচড়গুলো বুঝতে পারতাম। প্রথমে মনে হয় বরফের ছোটো ছোটো ছুরির মতো আঙুল দিয়ে কে যেন আমার কানের পাশের চামড়াগুলো খিমচে দিচ্ছে। এতই শীতল সেই আঙুল, আর এতই ধারালো সেই নখ, যে প্রথমে মনে হয় আমার ঘাড়ে আর মাথায় কোনো সাড় নেই। পরে অবশ্য ধীরে ধীরে একটা জ্বলুনিভাব ফিরে আসতে থাকে ওখানে। তখন আয়নার সামনে দাঁড়াতেই হয়।

আর বুঝতে পারি যে ও আবার কিছু একটা বলবে আমাকে।

বলবে ধীরে ধীরে, প্রায় না শোনার মতোই। আর আস্তে আস্তে সেই স্বর আমাকে গ্রাস করে ফেলবে। এতই অমোঘ সেই স্বর যে আমি তার হাত এড়াতে পারি না, সে যেন আমার মাথার মধ্যে এক মসৃণ, হিমশীতল জাল বুনে চলে।

আর তখন আমি বুঝতে পারি, ফের সেই সময় এসেছে।

লোকে আমাকে পাগল ভাবে। শুধু পাগল নয়, বদ্ধ

উন্মাদ। সেইজন্যই আমি জলাভূমির লাগোয়া ঘরটা ছেড়ে রাস্তায় প্রায় বেরোই না। অবশ্য লোকের কথায় আমি যে খুব কেয়ার করি, তা নয়। কারণ আমি জানি এই লোকগুলো আমার কেউ না। এদের আমার কোনো প্রয়োজন নেই। এই জায়গাটাই আমার নয়। আমি আসলে অন্য দুনিয়ার লোক। ওর দুনিয়া।

এই পৃথিবীর বাইরে যে দুনিয়াটা আছে, ওর কথা শুনলে সেখানে আমাকে নিয়ে যায় ও। আমাকে রাজা করে দেয় কয়েকদিনের জন্য। সেখানে আমার ইচ্ছেই সব। সেখানে ও আমার গলায় ঢেলে দেয় দামি মদ, ভোগ করার জন্য এনে দেয় সুন্দরী বেশ্যাদের। আমি তাদের ঊরুসন্ধিতে রক্তের মতো লাল মদ ঢেলে চেটে চেটে খাই। তখন এই দুনিয়াটা ফালতু মনে হয়। তখন মনে হয় এই নোংরা পৃথিবীতে যা যা করছি সব মিথ্যে। এমনকি খুন করাটাও।

কী, চমকে উঠলেন নাকি?

হ্যাঁ, খুন। আমি খুন করি। ও আমাকে দিয়ে খুন করায়। ঘাড়ের কাছে ফিশফিশ করে ও আমাকে বলে সে ওর রক্ত চাই। আর তার বদলে... সে তো বললামই।

এমনটা নয় যে আমি স্বেচ্ছায় কাজটা করি। প্রথমে আমি প্রবল আপত্তি জানাই। নিজেই নিজের মাথার চুল ধরে ঝাঁকাতে থাকি। তারপর ধরার চেষ্টা করি ওকে, নিজের নখগুলো গেঁথে দিই চামড়ার ভেতরে। ফালাফালা করে দিই নিজের গাল। জুলপি বেয়ে নেমে আসে রক্তের স্রোত।

কিন্তু না, আজ অবধি নাগাল পাইনি ওর। ও আমার পাগলামি দেখে খিলখিল করে হাসে। আমি আমার মাথার ভেতর সেই হাসি শুনতে পাই। তারপর যখন ভাঙা আয়নাটার সামনে দাঁড়িয়ে হাঁপাতে থাকি, চোখায় কোনায় রক্ত জমে আসে, তখন ও কথা বলতে শুরু করে।

তারপর আমি শান্ত হয়ে যাই। একদম শান্ত। আমার মাথার ভেতরে ওর কথাগুলো কোকেনের নেশার মতোই ছড়িয়ে পড়ে। আমার কোনো উপায় থাকে না ওর কথা শোনা ছাড়া।

কথা মানে রক্তের কথা। খুন.করার কথা।

তাই বলে সবসময় যে ও আমাকে খুন করতে বলে তা নয়। ধরুন বেশ কয়েকদিন হয়তো ওর পাত্তাই নেই। আমি বাইরে যাই, চলেফিরে বেড়াই। রাস্তায় কুড়িয়ে পাওয়া বেওয়ারিশ বেড়ালের বাচ্চা গলা টিপে মারি, স্মিথের দোকান থেকে শুকনো রুটি আর মুরগির স্যুপ কিনে খাই। ভাবি এইবার বোধহয় ও আর আসবে না।

আর ঠিক তখনই ও আসে। আর ব্যাপারটা সচরাচর ঠিক এইভাবেই শুরু হয়।

ও ডাকে আমাকে। কানের কাছে ফিসফিস করে বলে, "একটা ভবঘুরে। এলসওয়র্থ রোড দিয়ে হাঁটছে। বেঁটে, মোটা, মাথায় টাক। ওর নাম মাইক। পরনে বাদামি সোয়েটার আর নীল রঙের কোট। সূর্য ডুবে যাওয়ার ঠিক দশ মিনিট বাদে ও এই জলাভূমির দিকে আসবে। ময়লার গাদাটার পাশে যে গাছটা আছে, তার নীচে দাঁড়াবে। ঠিক দশ মিনিট। গলার কাছটায়, ঠিক গলার কাছটায়..."

আর আমি আমার বহুদিনের বিশ্বস্ত সঙ্গী, ছ-ইঞ্চির মাংস কাটার ছুরিটা নিয়ে বেরিয়ে পড়ি। মাথার মধ্যে টিকটিক করতে থাকে, দশ মিনিট, ন মিনিট, আট মিনিট...

আর ও আমার মাথার মধ্যে ফিসফিসিয়ে বলে যেতে থাকে, "গাছের আড়ালে যাও। এইবার, এইবার, ওকে নীচু হতে দাও। ঝাঁপাও, ঝাঁপিয়ে পড়ো..."

আমি জানি ওর কখনও ভুল হয় না। এই ডাক অমোঘ, অব্যর্থ। আমি জানি ও আমাকে কখনও বিপদে ফেলবে না।

ফেলতে পারে না। ও আজ অবধি আমাকে কোনোদিন বিপদে ফেলেনি।

শুধু এবারেরটা ছাড়া।

সেদিন আমার ঘরে বসে রাতের খাওয়ার সারছি, এমন সময় ও এল।

"একটা মেয়ে এদিকেই আসছে। তোমার সঙ্গে দেখা করবে বলে। কালো রঙের পোশাক। ভালো দেখতে। গাড়ি নিয়ে শহরে যাচ্ছিল। এই রাস্তাটা নিয়েছিল শর্টকাট হবে বলে। গাড়ির টায়ার ফেঁসে গেছে। তোমার সাহায্য চাইবে। ও আসছে।"

আমার শরীর টানটান হয়ে গেল। মাথার মধ্যে তখনও বলে চলেছে ও, "তোমার সাহায্য চাইবে মেয়েটা। তুমি যাবে। ছুরিটা সাবধানে নিও। খুনটা কিন্তু ছুরি দিয়ে করবে না। গাড়িতে একটা রেঞ্চ আছে। ওটা দিয়েই..."

"না," আমি প্রতিরোধ করার চেষ্টা করলাম এবার, "আমি পারব না, পারব না।"

সেই সরু খিলখিলে হাসিটা ভেসে এল, "তুমি করবে না? তাহলে তো আমাকেই করতে হবে। তুমি কী চাও আমি করি? নাকি তোমাকেই..."

"না, না", আমি আর্তচিৎকার করে উঠি, "করব, আমি করব। যা বলবে তাই করব।"

"কী করব বল?" চুক চুক করে ও, "আমার যে দরকার হয়। আমার যে খিদে পায়। না খেলে দুর্বল হয়ে পড়ব না? আর আমি দুর্বল হয়ে পড়লে তোমার জন্যে কে এনে দেবে মদ? কে তোমার বিছানায় এনে দেবে সুন্দরী মেয়েদের? তুমি কি চাও না ওসব?"

"করছি, আঃ!" সজোরে নিজের মাথা চেপে ধরি আমি, "চুপ করো, চুপ করো। বলছি তো আমি করছি, করছি।"

ঠিক তক্ষুনি দরজায় ঠকঠক আওয়াজ করে কেউ। বুঝলাম, সে এসেছে।

একে মেয়েটাকে মারকাটারি সুন্দর দেখতে, তার ওপর একমাথা সোনালি চুল। আমার আবার সোনালি চুল খুব পছন্দ, তাই রেঞ্চটা মেয়েটার মাথায় মারিনি, যদি রক্তে অমন সুন্দর চুল নষ্ট হয়ে যায়?

আঘাতটা করলাম ঘাড়ে। একবারই যথেষ্ট ছিল। মেয়েটা আওয়াজ করার সময়ই পায়নি।

বডি কোথায় লুকোতে হবে সেটা অবশ্য বেশি ভাবতে হয় না আমাকে। প্রথম বারে খুন করার সময়েই ও দেখিয়ে দিয়েছিল চোরাবালিটা, এবারেও তাই। এমনকি পায়ের ছাপ মুছে ফেলার বুদ্ধিটাও ওরই।

মুশকিল হচ্ছিল গাড়িটা নিয়ে। শেষে ওর কথামতোই একটা পাইন গাছের লজ্‌ঝড়ে গুঁড়ি দিয়ে গাড়িটাকে চোরাবালিটায় ফেললাম। এটা বরঞ্চ মেয়েটার থেকে তাড়াতাড়ি ডুবল। গাড়িটার শেষ চিহ্নটুকু মুছে যেতেই রেঞ্চটারও একই গতি করলাম।

সব শেষ করে যখন বেশ নির্ভার হয়ে ঘুমোতে যাচ্ছি, তখন বুঝলাম যে ও নেই, মাথা থেকে নেমে গেছে। জলাটার দিকেই গেছে নিশ্চিত। ভাবতে ভাবতেই গুটিশুটি মেরে ঘুমিয়ে পড়লাম। যাক, দিনকয়েকের জন্য ওর হাত থেকে মুক্তি।

কতক্ষণ ঘুমিয়ে ছিলাম জানি না। যখন জেগে উঠছি, বুঝতে পারলাম যে ও আবার আমার কাছে ফিরে এসেছে। একবার খিদে মেটাবার পর সচরাচর দিন কয়েক ও আমার ধারেকাছে ঘেঁষে না। তাই বুঝলাম কিছু একটা গণ্ডগোল হয়েছে কোথাও।

তারপরেই আমি হুড়মুড়িয়ে উঠে বসলাম। কে যেন আমার দরজা ধাক্কাচ্ছে জোরে জোরে।

বুঝতে পারছিলাম না এখন আমার কী করা উচিত। এসব ক্ষেত্রে সচরাচর ওই আমার কানে কানে বলে দেয় কী করতে হবে। কিন্তু বুঝতে পারলাম যে ও এখন চুপ। অনেক বার ডেকেও ওর কোনো সাড়া পেলাম না।

এদিকে দরজাটার ওপর গুম গুম আওয়াজটা বেড়েই যাচ্ছিল। আর থাকতে না পেরে আমি গিয়ে দরজাটা খুলে দিলাম।

বাইরে দাঁড়িয়ে এই শহরের শেরিফ, বুড়ো শেলবি!

"ওঠ রে সেথ, তোর খেলা এবার শেষ। চুপচাপ আমার সঙ্গে আয়।" বিনা ভূমিকায় কথাটা বলে আমার ঘরের কোণায় কোণায় ইতিউতি তাকাতে শুরু করল লোকটা। মনে হল যেন তন্নতন্ন করে কী একটা খোঁজার চেষ্টা করছে ও।

আমার পা দুটো কে যেন মাটিতে গেঁথে দিয়েছিল, মাথাটা ভোঁ ভাঁ করতে শুরু করে। শিরদাঁড়া বেয়ে নেমে যাচ্ছিল একটা চিনচিনে আতঙ্কের স্রোত। প্রথমে ভয় হল, শেরিফ ওকে দেখতে পাচ্ছে না তো? পরমুহূর্তেই অবশ্য আমার ভুল ভাঙে। আমিই ওকে দেখতে পাইনি আজ অবধি, শেরিফ কী করে পারবে? তবে বুঝতে পারছিলাম যে ও আছে। আমার ব্রহ্মতালুর ঠিক নীচে। রক্তমাংস আর শিরার ওমে মজাসে ঘুমিয়ে আছে ব্যাটা। মাথার চুলে একটা আলতো টানও অনুভব করছিলাম যেন।

"এমিলি রবিন্স", ঠান্ডা গলায় বলল শেরিফ শেলবি, "প্রত্যক্ষদর্শীদের বয়ান অনুযায়ী হাইওয়ে ছেড়ে এই জলার ধার দিয়ে আসছিল, শর্টকাট হবে বলে।" বলে থামল বুড়ো লোকটা, তারপর কুতকুতে চোখ দুটো আমার চোখে রেখে বলল, "টায়ারের দাগ বলছে মহিলা এদিকে এই জলার দিকেই এসেছিলেন। তারপর?"

ইস্, একটা মস্ত ভুল হয়ে গেছে দেখছি! টায়ারের দাগটা

মোছার কথা মাথাতেই আসেনি। এটা বোধহয় ও-ও ভাবেনি যে বুড়ো শেলবি টায়ারের দাগ ধরে এতদূর চলে আসবে। কুকুরের মতো নাক লোকটার!

"যা বলবি ভেবেচিন্তে বলবি। কারণ মনে রাখিস, আইন মোতাবেক কিন্তু তোর কথা তোর বিরুদ্ধেই আদালতে ব্যবহার করা হতে পারে।" আমার হাতে হাতকড়া পরাতে পরাতে বলল বুড়ো শেলবি। "চল এখন। তোর কপালে বিস্তর দুঃখ আছে দেখছি।"

পুলিশের গাড়িটা জলার বাইরে রাস্তার ওপর রাখা ছিল। গাড়িটা যখন আমাকে নিয়ে যাচ্ছে, দেখি রাস্তার পাশে লোকজন ভিড় করে আছে। তাদের চোখে যেটা দেখলাম সেটাকে ঘেন্না ছাড়া আর কিছুই বলা যায় না। বখাটে ছেলেরা খিস্তি করতে শুরু করল, কয়েকজন আবার সবাইকে উসকাচ্ছিল, যাতে আমাকে টেনে বার করে এনে পিটিয়ে মেরে ফেলা যায়।

তবে শেলবি শক্ত লোক। সে ঠিক আমাকে এদের হাত থেকে বাঁচিয়ে এনে শহরের থানার ভেতরে একটা সেলে পুরে দিল। থানায় তিনটে সেল থাকলে কী হবে, বাকি দুটো খালি। ফলে এখন আর কেউ রইল না আমার সঙ্গে।

শুধু একজন ছাড়া। ও।

আমি ভেবে আশ্চর্য হচ্ছিলাম, এই যে এত কাণ্ড ঘটে গেল, এর মধ্যে কিন্তু একটিবারের জন্যও ও জাগেনি। ওর যেন কোনো আগ্রহই নেই এই ব্যাপারে। আমার মাথার ভেতরে, রক্তমাংস আর স্নায়ুর মধ্যে একটা ডেলার মতো শুয়ে ছিল ও। নির্জীব, নিস্পন্দ।

তখন সবে সকালটা শুরু হয়েছে। শেরিফ শেলবি আরও কয়েকজনকে নিয়ে বেরিয়ে গেল জলার দিকে। বোঝাই যাচ্ছিল যে ওরা জলাটা তন্নতন্ন করে খুঁজে দেখবে। যদি চোরাবালি থেকে মেয়েটার বডি পায় ওরা, তাহলে আমার যে কী হবে

ভেবে আমার হাত পা ঠান্ডা হয়ে আসছিল।

যে হাবিলদারটা আমাকে সকালের খাবার দিতে এল তাকে আমি চিনি। ওর নাম চার্লি পটার। বুড়ো শেলবি ওকেই এই জেলখানার দায়িত্ব দিয়ে রেখেছে। ছোকরাকে আমার কোনোদিনই খুব একটা খারাপ লাগেনি। তবে বড়ো বেশি প্রশ্ন করছিল বলে বিরক্ত লাগছিল খুব। বলা বাহুল্য ওর বকবকানির উত্তর দেওয়ার কোনো প্রয়োজনই বোধ করিনি। কারণ আমি জানি যে আমি যা বলব তার একবর্ণও ও বিশ্বাস করবে না। উলটে আমাকে পাগল ঠাওরাবে। যেমন থানার বাইরে দাঁড়িয়ে আমাকে ক্রমাগত খিস্তি করে যাওয়া লোকগুলো আমাকে পাগল ভাবে। যেমন আমার মাকেও ওরা পাগল ভাবত, জলার ডাইনি বলে ডাকত!

চার্লিকে দেখে অবশ্য মনে হল না আমার চুপচাপ থাকাটা ও লক্ষ করেছে বলে। ও বলেই যেতে থাকল, শেরিফ শেলবির মত হচ্ছে এমিলি রবিন্সের কেসটার সঙ্গে আরও বেশ কিছু লোকের উধাও হওয়ার একটা যোগসূত্র আছেই। ওর মতে, একটা বেশ বড়োসড়ো কেসে আমি ফাঁসতে চলেছি। কারণ ইতিমধ্যেই নাকি জেলার সরকারি উকিলকে এত্তেলা দেওয়া হয়েছে আমাকে জেরা করার জন্য। এমনকি একজন ডাক্তারকেও নাকি ডাকা হয়েছে আমাকে পরীক্ষা করে দেখবে বলে।

বলতেই বলতেই ডাক্তার সাহেব দর্শন দিলেন। দেখে মনে হল থানার বাইরে আমার মুণ্ডু চেয়ে স্লোগান দেওয়া বজ্জাতগুলোর ভিড় সরিয়ে এতদূর আসতে ভদ্রলোককে বেশ বেগ পেতে হয়েছে। উনি এসেই অবশ্য একটা ভালো কাজ করলেন, বকবকে চার্লিকে বললেন থানার সামনে গিয়ে ভিড় সামলাতে।

ডাক্তারবাবুকে অবশ্য আমি ভালো করেই চিনি। ডক্টর

সিলভার স্মিথ তাদের মধ্যে একজন যারা আমার মা প্রথমবার ধরা পড়ার পর আমাকে অনাথাশ্রমে পাঠাতে চেয়েছিলেন। মানুষটি আকারে ছোটোখাটো, থুতনিতে সাদা কালো ছাগুলে দাড়ি। আমাকে দেখেই প্রথম প্রশ্ন করলেন ভদ্রলোক, "তোমার মা এখনও বেঁচে আছে? এখনও ওইসব করে বেড়াচ্ছে?"

শুনে কেমন যেন মনে হল লোকটা বেশ ভালো, ভরসাযোগ্য। এ আমাকে চেনে, আমার মাকে চেনে। এমনকি আমার মা কী কী করত সেসবও জানে। একে সব কথা খুলে বলাই যায়, তাই না?

ফলে আমার পক্ষে আর লোকটাকে সবকিছু খুলে বলার ক্ষেত্রে কোনো বাধাই রইল না। সব কিছু বেশ গুছিয়েই বললাম ছাগলদেড়েটাকে। আমার কথা, আমার মায়ের কথা, মায়ের ওই তুকতাক, জড়িবুটি এসবগুলোর কথা। মায়ের বিছানায় নীচে রাখা ছেঁড়াখোঁড়া বইগুলোর কথা, তাকের ওপর রাখা শিশি-বোতলগুলোর কথা।

এমনকি অমাবস্যার রাতে মা যে আমাদের কুঁড়েঘরটা ছেড়ে জলার পাশের জঙ্গলটায় চলে যেত, আর সেখান থেকে অদ্ভুত সব সুরেলা আওয়াজ ভেসে আসত, সেসব কথাও খুলে বললাম ডাক্তারটাকে।

অবশ্য এতকিছু বলার দরকার ছিল না। আমার মাকে লোকে ডাকত জলার ডাইনিবুড়ি বলে। ফলে মায়ের ব্যাপারে অনেকেই অনেক কিছু জানত। এমনকি স্যান্টো ডিনোরেলির কুমারী মেয়ে যে মায়ের দেওয়া ওষুধ খেয়ে পেট খসাতে গিয়ে মরে যায়, আর সেই রাগে স্যান্টো আমার মাকে আমার সামনেই কুপিয়ে কুপিয়ে মেরে ফেলে, সে কথাটাও জানত ডাক্তার। তারপর থেকে আমি যে ওই কুঁড়েঘরে একা একাই থাকি, সেটাও।

ফলে একবার ভাবলাম লোকটাকে ওর ব্যাপারেও

সবকিছু খুলে বলব কি না। মানে বলাটা ঠিক হবে কি না। তারপর আগুপিছু ভেবে সবকিছু খুলে বলাই সাব্যস্ত করলাম। সবকিছু বলতে এই যে আমি খুন-টুন করি, মানে সেসবই যে আসলে ওই করে, অর্থাৎ কি না ও আমাকে দিয়ে করায়, এসবই। এমনকি মা যেদিন আমার জন্য ওকে কিনতে গেছিল সেদিনকার কথাও। সেদিনের পুরো ব্যাপারটা অবশ্য ভালো বলতে পারলাম না। কারণ জঙ্গলে যাওয়ার সময় মা সঙ্গে নেয়নি আমাকে। শুধু একটা জিনিসই নিয়ে গেছিল মা।

আমার রক্ত। একটা ছোটো শিশিতে।

মা সেদিন একা ফেরেনি। আর-একজনকে সঙ্গে নিয়ে ফিরেছিল।

ওকে নিয়ে।

আসার পর মা আমাকে ফিসফিস করে বলেছিল যে, এবার থেকে ওই আমার দেখভাল করবে, যা চাই তাই এনে দেবে, বিপদ-আপদ থেকে রক্ষা করবে।

মা বোধহয় সেই রাতে বুঝতে পেরেছিল কিছু একটা। কারণ পরের দিন সকালেই স্যান্টো আমাদের কুঁড়েঘরে হানা দেয়। তারপর একটা মাংস কাটার ছুরি দিয়ে... ও... তারপরের ব্যাপারটা তো জানেনই আপনারা।

আমি ডাক্তার স্মিথকে ওর ব্যাপারটা খোলাখুলিই বললাম। এতদিন ধরে ও আমাকে কীভাবে আগলে আগলে রেখেছে, আমাকে সব বিপদ-আপদ থেকে রক্ষা করে এসেছে, এমনকি প্রতিটা খুন করার সময় কী করে আমাকে ও সবদিক দেখেশুনে কাজ করতে শিখিয়েছে। মা যেমন ভেবেছিল, ঠিক তেমনই। কথাটা বলতে বলতে আমার বেশ হালকাই লাগছিল। হাজার হোক ডাক্তার সিলভার স্মিথ মান্যগণ্য লোক, ব্যাপারটা বুঝবেন নিশ্চয়ই।

কিন্তু কথাগুলো বলা শেষ করে লোকটার চোখে চোখ

পড়তেই থমকে গেলাম। লোকটার ধূর্ত চোখ দুটো আমার ওপর ঘুরে বেড়াচ্ছিল, সেই দৃষ্টিতে অবিশ্বাস ছাড়া কিছুই ছিল না। বুঝতে পারলাম যে এতক্ষণ ধরে যা যা ভেবেছি লোকটার ব্যাপারে, সব ভুল।

আমি থেমে যেতেই লোকটা যতসব অদ্ভুত প্রশ্ন করতে শুরু করল। যেমন ও কোথায় থাকে। যদি ওকে দেখতেই না পাই তবে ওর কথা শুনতে পাই কী করে। মাঝেমাঝেই আমি এইরকম অদৃশ্য বাণী-টানী শুনতে পাই কি না। এমনকি এমিলি রবিন্সকে খুন করার সময়... না না ওসব কথা আমি বলব না, একদম না। আমি কি পাগল নাকি?

তবে লোকটাকে যতটা চালাক ভেবেছিলাম, লোকটা দেখলাম তার থেকেও অনেক বেশি ধূর্ত। ওকে না চেনার ভান করে করেই আমার পেট থেকে বেশ কিছু কথা টেনে বের করে নিল। যেমন আরও কতজনকে খুন করেছি, এমনকি তাদের মুণ্ডুগুলো কোথায় রেখেছি, সেসব অবধি! কী বদমাশ মাইরি। আমিও অবশ্য কম সেয়ানা নই। ব্যাপারটা বুঝতে পেরেই স্রেফ শামুকের মতো গুটিয়ে গেলাম। উঁহু, হতচ্ছাড়াটাকে আর একটা কিচ্ছু যদি বলেছি।

অনেক চেষ্টাচরিত্র করার পর লোকটা হাল ছেড়ে দিয়ে মাথা নাড়তে নাড়তে উঠে যেতেই ফিকফিক করে হেসে ফেললাম। বেশ জব্দ হয়েছে ব্যাটাচ্ছেলে। ওর সব জানা চাই, না? আমার ব্যাপারে, আমার মায়ের ব্যাপারে, ওর ব্যাপারে। চল ফোট বে, কোথাকার কে রে!

এর পরে আমার বিশেষ কিছুই করার নেই দেখে একটা টেনে লম্বা ঘুম দিলাম।

ঘুম যখন ভাঙল তখন বেশ বেলা গড়িয়ে গেছে। আমি আড়মোড়া ভেঙে উঠেই দেখি আমার সামনে আর-একটা লোক দাঁড়িয়ে। এটা আবার ডাক্তারটার মতো বাঁটকুল নয়,

বেশ লম্বাচওড়া মোটাসোটা লোক। মুখে একটা গ্যালগ্যালে হাসি লেগে আছে।

"হেঁ হেঁ, অসময়ে ঘুম ভাঙিয়ে দিলাম নাকি?" মিষ্টি করে বলল লোকটা।

আমি চট করে একবার মাথার ওপর হাত বুলিয়ে নিলাম। ও আবার এই ফাঁকে কোথাও চলে-টলে যায়নি তো?

নাহ, ওখানেই আছে ও, যেখানে ছিল। গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন।

"আরে অত চমকাবার মতো কিচ্ছুটি হয়নি। হেঁ হেঁ, আমাকে তোমার বন্ধুই ভাবতে পার ভায়া।"

"ডাক্তারটা পাঠাল নাকি তোমাকে?" সন্দিগ্ধ স্বরে প্রশ্ন করলাম আমি।

"আরে ধুর," মাছি তাড়াবার ভঙ্গিতে প্রশ্নটা উড়িয়ে দিল লোকটা, "আমার নাম ক্যাসিডি, এডউইন ক্যাসিডি। আমি হলাম গিয়ে এই জেলার সরকারি উকিল, বুঝলে কি না। বলি বসতে-টসতে বলবে না?"

"এটা আমার বাড়ি না যে অতিথিকে বসতে বলব," নীরস কণ্ঠে বললাম আমি।

"হেঁ হেঁ, সে তো বটেই, সে তো বটেই। তবে তোমার বাড়ি যাওয়ার ব্যবস্থা করতেই এসেছি ভায়া।" বলতে বলতেই চাবি দিয়ে সেলের দরজা খুলে ভেতরে চলে এল লোকটা। বসল আমার পাশেই, বেশ জুত করে।

"ভয় লাগছে না তোমার?" প্রশ্ন করলাম আমি, "মানে আমি খুন-টুন করেছি কি না, তাই বলছি।"

"আরে ধুর পাগল, ভয় কীসের?" বলতে বলতে বেশ স্নেহের সঙ্গেই আমার কাঁধে নিজের ভারী হাতটা রাখল লোকটা। খেয়াল করলাম যে লোকটার হাতে বেশ বড়োসড়ো একটা হিরের আংটি। রোদ্দুরের আলো সেই হিরের ওপর

ঝিকিয়ে উঠে মেঝেতে চিত্রবিচিত্র নকশা তুলছিল।

"তারপর সেথ, তোমার ও কেমন আছে?"

আমি লাফিয়ে উঠলাম। মানে? এ কী করে জানল ওর কথা?

"আহা, আহা," লোকটা প্রায় হাঁ হাঁ করে উঠল, "অমন চমকে ওঠার মতো কিছু হয়নি ভায়া। বোকা ডাক্তারটার সঙ্গে রাস্তার মোড়ে দেখা হয়েছিল কি না, সেই জানাল আমাকে ওর কথা। তবে ব্যাটা বেকুবের হদ্দ। আমি তো শোনামাত্র বুঝে গেছি কেসটা কী। আর ব্যাটার মাথায় নির্ঘাত গোবর পোরা, ব্যাপারটা ধরতেই পারেনি।" এই বলে লোকটা ভুঁড়ি দুলিয়ে খ্যা খ্যা করে হাসতে লাগল।

লোকটার দিকে তাকিয়ে আমি শুকনো গলায় বললাম, "ডাক্তার নিশ্চয়ই এও বলেছে যে আমি পাগল।"

"ডাক্তারকে দোষ দিয়ে লাভ নেই ভায়া, প্রথম প্রথম আমি নিজেও বিশ্বাস করিনি। তবে আমি এখন জলার ধার থেকেই আসছি কি না। স্বচক্ষে দেখে এলাম চোরাবালি থেকে এমিলি রবিন্সের বডি টেনে তোলা হচ্ছে। এমনকি শেরিফ তো ওই জলা আর চোরাবালি তোলপাড় করে ফেলছে আরও হারিয়ে যাওয়া লোকের খোঁজে। আমি নিজেই তো আরও তিনটে বডি দেখে এলাম, একটা বেঁটে মতো লোকের, একটা বাচ্চা ছেলের আর শেষেরটা বোধহয় একটা ইন্ডিয়ানের। চোরাবালির মধ্যে থাকলে বডি পচে যায় না, জানোই তো, হেঁ হেঁ।"

আমি স্থির ভাবে লোকটার হাসি হাসি মুখের দিকে তাকিয়ে রইলাম। না। এও ডাক্তারটার মতো আমাকে পাগল ভাবছে না তো?

আরও কাছে ঘনিয়ে এল লোকটা, "ওদের সঙ্গে বাজি ধরেছি, বুঝলে ভায়া, যে চোরাবালিটা ভালোভাবে খুঁজে দেখলে

আরও বেশ কিছু বডি পাওয়া যাবে। কি, ঠিক বলিনি?"

মাথা নাড়লাম। পাওয়া যে যাবে তাতে আর সন্দেহ কি?

"একদম। আর যেই না সেটা বুঝেছি, অমনি টক করে মাথায় খেলে গেছে যে তার মানে তোমার ওই ওর কথাটা নিয্যস সত্যি। ওইই তোমাকে দিয়ে এইসব করিয়েছে, ঠিক কি না?"

"হুঁ", ছোট্ট করে জবাব দিলাম আমি।

"বেশ বেশ," উত্তেজনায় হাতে হাত ঘষল লোকটা। "আজ অবধি ঠিক তোমাকে দিয়ে ঠিক ক-টা খুন করিয়েছে তোমার ওই ও?"

"ন-টা," নির্জীব স্বরে বললাম আমি।

"আর সবকটাকেই ওই চোরাবালির মধ্যেই পাওয়া যাবে, তাই তো?" ফিসফিস করে জিজ্ঞেস করল ক্যাসিডি।

"হ্যাঁ।"

"সবার নাম বলতে পারবে?"

"ধুর, তাই হয় নাকি? ও কি আমাকে নাম বলে দিয়ে খুন করতে বলত নাকি? এই ধরো বলে দিল কেমন দেখতে, বা কোথায় আছে, বা কী করছে..."

লোকটার চোখেমুখে উত্তেজনা ফেটে পড়ল, "তুমি বড়ো কাজের লোক ভায়া, বড়োই কাজের লোক। তোমার সঙ্গে আমার একটা কথা আছে, বুঝলে। তার আগে একটা কথা বলো, সরকারি উকিল বলতে কী বোঝায় জান তো?"

"ওই যে কালো কোট পরে আদালতে দাঁড়িয়ে সওয়ালজবাব করে।" নিস্পৃহ স্বরে জবাব দিলাম আমি।

"শাব্বাশ। এবার বলো তো বাপু, তুমি কি চাও যে তোমাকে ভরা কোর্টরুমে কাঠগড়ায় দাঁড় করিয়ে সওয়ালজবাব করা হোক?"

"একদম না মিস্টার ক্যাসিডি, একদম না। শালারা

কুত্তার মতো খেপে আছে। আমাকে দেখলেই আদালত থেকে বার করে পিটিয়ে মারবে। আমি কিছুতেই কাঠগড়ায় উঠব না," আমি আঁতকে উঠলাম।

"হুম তাহলে ভায়া, তোমায় যে একটু সাহায্য করতে হচ্ছে তোমার এই দাদাটিকে। তুমি তোমার ওই ওর কথা আমাকে খুলে-টুলে বলো, আমি না হয় তোমাকে যাতে কাঠগড়ায় না দাঁড়াতে হয় সেটা দেখছি। কী বল?"

মাথা ঠান্ডা করে ব্যাপারটা একবার ভাবলাম। আমার তো প্রস্তাবটা ভালোই লাগল, ফলে গলা ঝেড়ে বলে ফেললাম, "বেশ, আমি রাজি।"

তারপর সব খুলে বললাম ওকে। সব কিছু। মানে একদম প্রথম দিন থেকে যা যা ঘটেছে তার সব কিছু।

আমার কথা বলার শেষদিকে লোকটা আর হাসছিল না। বরং গম্ভীর মুখে খুব মনোযোগ দিয়ে আমার প্রত্যেকটা কথা শুনছিল।

আমার বলা শেষ হলে খানিকক্ষণ চুপ করে রইল লোকটা, তারপর আমার দিকে তাকিয়ে ঠান্ডা গলায় বলল, "সবই তো শুনলাম আর সবই বুঝলাম। শুধু একটা কথা খোলসা হল না ভায়া।"

আমি সপ্রশ্ন চোখে চেয়ে রইলাম লোকটার দিকে।

"ডেডবডির মাথাগুলো কোথায়?"

আমি মুখ ঘুরিয়ে নিলাম, "জানি না, বলতে পারব না।"

"জান না, নাকি বলতে পারবে না? কোন্‌টা?"

"জানি না। ওগুলো তো আমি ওকে দিতাম। তারপর ও মাথাগুলো নিয়ে কী করত সে আমি কী করে বলব?" বেশ বিরক্তই হলাম আমি।

ক্যাসিডিকে দেখে মনে হল বক্তব্যটা বোধহয় ঠিকঠাক হৃদয়ঙ্গম হয়নি তার।

"আরে বুঝলে না?" সহজ ব্যাপারটা বোঝাবার চেষ্টা করি লোকটাকে, "খুন করার পর লোকগুলোর মাথা কেটে আমি বডিগুলো চোরাবালিতে ডুবিয়ে দিতাম। তারপর মাথাগুলো ওখানেই রেখে আমি চলে আসতাম আমার ঘরে। তারপর আমাকে ঘুম পাড়িয়ে দিত ও, সে বড়ো শান্তির ঘুম। শুধু এটুকু জানি যে তারপর ও সেই মাথাগুলোর কাছে যেত। গিয়ে কী করত সে নিয়ে আমার কোনোদিনই কোনো মাথাব্যথা ছিল না, আজও নেই। যেত এইটুকু মাত্র বলতে পারি।"

"কিন্তু... কিন্তু..." লোকটা প্রায় তুতলে গেল, "তুমি এসব করতে কেন ওর জন্যে?"

"আরে মর! যন্ত্রণা!" খুব বিরক্ত হলাম আমি, "বললাম যে, আমি এসব না করলে ও আমার সঙ্গেই কাজটা করত, মানে করবার ধমকি দিত! এর পরেও ওর কথা শুনব না, আমার ঘাড়ে কি একটার বেশি মাথা?"

লোকটা আমার দিকে হাঁ হয়ে চেয়েছিল দেখে একটু মায়াই হল ওর প্রতি। "তুমি আবার এসব বলার জন্য আমাকে কাঠগড়ায় দাঁড় করাবে না তো?"

"না। একদম না।" লোকটা ওর বিশাল শরীরটা নিয়ে আমার ওপর ঝুঁকে এল প্রায়, "ওর কথা কেউ বলবে না, আমিও না, তুমিও না। তোমার বিচারের সময় ওর কথা যাতে না ওঠে তার সব ব্যবস্থা করব আমি।"

"কিন্তু কেন?" এবার আমার একটু সন্দেহ হতে লাগল, "ওর কথা উঠবে না কেন শুনি?"

"কারণ তুমি ওকে ভয় পাও, তাই না সেথ?" আমার মুখের ওপর বড়ো বড়ো লালচে চোখ দুটো মেলে বলল ক্যাসিডি, "তুমিও চাও না যে ওর কথা সবাই জানুক, তাই না?"

আমি এত ঘাবড়ে গেছিলাম যে প্রথম প্রথম কিছু

বলতেই পারলাম না।

"শোনো সেথ। এই জেলহাজত থেকে বাঁচবার একটাই রাস্তা, "বলে একবার থামল লোকটা, তারপর আমার চোখে চোখ রেখে বলল, "তোমার ওই ওকে আমাকে দিয়ে দাও।"

আমি হাঁ করে চেয়ে রইলাম লোকটার দিকে। ব্যাটাচ্ছেলে বলে কী? ওকে দিয়ে দেব মানে? লোকটার মাথার ঠিক আছে তো?

ক্যাসিডি বোধহয় আমার দিকে তাকিয়ে আমার মনের কথা বুঝতে পারল। আমি কিছু বলে ওঠার আগেই তড়িঘড়ি বলে উঠল সে, "কথাটা ভালো করে বোঝো ভায়া। যদি ও তোমার কাছে না থাকে, তবে তো ওর ব্যাপারে তোমার কিছু না বললেই চলে, তাই না? আর সবাইকে যে ওর ব্যাপারে বলে বেড়ানো হচ্ছে সেটা তো ও নাও পছন্দ করতে পারে। আর ও যদি কোনোকিছু অপছন্দ করে তবে তার ফল কী হয়, সে তো তুমি জানোই।"

ঘাড় নাড়লাম। সে কথা আমার থেকে বেশি ভালো আর কে জানে?

"কিন্তু... কিন্তু ও যদি তোমার কাছে যেতে না চায়?"

ক্যাসিডি এসে ওর মোটা হাতটা আমার কাঁধে রাখল। তারপর গাঢ় স্বরে বলল, "সেটা তুমি দেখবে। এত বড়ো একটা বিপদ থেকে তোমাকে বাঁচাচ্ছি, এইটুকু আমার জন্য করবে না তুমি? আমি ওকে যথেষ্টই যত্নআত্তি করব, সেটাই বা কম কী?"

কথাটা আমার খুব একটা খারাপ যে লাগল তা নয়। যে দ'য়ে মজেছি তার থেকে উদ্ধার পাওয়ার এর থেকে ভালো উপায় আর কী আছে? বিশেষ করে ও যখন একেবারেই চুপচাপ, এখান থেকে আমাকে উদ্ধার করার কোনো ইচ্ছাই ওর মধ্যে দেখা যাচ্ছে না।

আমার দিকে সাগ্রহে তাকিয়েছিল লোকটা। আমাকে প্রশ্ন করল, "ও এখন কোথায়?"

নিজের মাথায় একবার হাত বুলিয়ে নিলাম, "এই যে এখানে, আমার তালুতে।"

ক্যাসিডি আমার দিকে তাকাল একবার, তারপর ফিক করে হেসেই ফেলল, "তাই নাকি?"

হাসিটা দেখে আমার বেশ সন্দেহ হল খানিকটা, লোকটাকে বিশ্বাস করা যাবে তো? তাই প্রশ্ন করলাম, "ওকে নেওয়ার মানে জান তো? মানে ওকে কাছে নেওয়ার কী কী ঝক্কি আছে সে নিয়ে ধারণা আছে কিছু?"

"আছে বইকি", খিকখিক হাসি চাপতে চাপতে বলল লোকটা।

"ও যা চায়, তা না পেলে কিন্তু ও সেটা জোর করে আদায় করে, জান তো?" সন্দিগ্ধ স্বরে প্রশ্ন করলাম আমি।

"হুঁ, সেও জানি হে ভায়া।" বেশ চকচকে মুখে বলল লোকটা, "এবার কথা না বাড়িয়ে ওকে আমার কাছে দাও দিকি।"

আমি খানিকক্ষণ চুপ করে রইলাম। তারপর ফিসফিস করে বললাম, "আছ?"

কোনো সাড়াশব্দ নেই।

"শোনো, উনি তোমাকে নিতে এসেছেন। উনি তোমাকে খুব ভালো রাখবেন, বুঝলে? যাবে নাকি?"

ও কিছুই বলল না। আমি তাকিয়ে দেখলাম ক্যাসিডি আমার সামনে মোটা ব্যাঙের মতো থেবড়ে বসে চোখের কোণ দিয়ে বিচ্ছিরি ভাবে হাসছে।

আমি আবার নিজের ভেতরে মনোযোগ দিলাম, আলতো আদরে বললাম, "যাও, উনি তোমাকে চাইছেন।"

ও চলে গেল।

ব্যাপারটা বুঝতে একটু সময় লাগল আমার। কিন্তু যখন বুঝলাম যে মাথাটা খালি খালি লাগছে, নিশ্চিত হলাম যে ও গেছে। আমার ঘাড় থেকে পুরোপুরি ভাবে বিদেয় হয়েছে ব্যাটা।

কথা নেই বার্তা নেই, ক্যাসিডি হঠাৎ করে উঠে দাঁড়াল। আমি সাগ্রহে জিজ্ঞেস করলাম, "গেছে? ও তোমার কাছে গেছে? বুঝতে পারছ কিছু?"

ক্যাসিডি কেমন যেন অদ্ভুত ভাবে তাকাল আমার দিকে। তারপর বলল, "হ্যাঁ, ও এসেছে। ইয়েস, ইয়েস... মাথার ভেতরটা... হ্যাঁ..."

ওকে অন্য কারও ঘাড়ে বিদেয় করেছি ভেবে যে বেশ উৎফুল্ল লাগছিল সে কথা অস্বীকার করব না। গদগদ স্বরে বললাম, "ওর কিন্তু ভালো যত্নটত্ন নিও, বুঝলে। নইলে কিন্তু ও..."

কথাটা ক্যাসিডির কানে গেল কি না বুঝতে পারলাম না। কারণ তখন ও লম্বা লম্বা পায়ে থানার দরজা পেরিয়ে চলে যাচ্ছিল। দৌড়াচ্ছিল বললেই চলে। আমি অবশ্য সেদিকে বেশিক্ষণ তাকিয়ে থাকতে পারিনি। ওকে ঘাড় থেকে নামিয়ে দেওয়ার পর মাথাটা হালকা হালকা লাগছিল কি না! তাই এবার আমি একটা জমাটি ঘুম দিলাম সেলের মেঝেতে শুয়ে।

ঘুমটা ভাঙল রাতের দিকে, সেলের দরজায় জোরদার ধাক্কা শুনে। জেগে উঠে দেখি আমার সুহৃদ, শ্রীমান চার্লি পটার আমার জন্যে রাতের খাবার এনেছে। আমি উঠে বসতেই প্রায় লাফিয়ে উঠল চার্লি।

"শুয়োরের বাচ্চা নরকের কুত্তা," খিস্তি করতে লাগল চার্লি, "ন-খানা বডি তুলেছে ওরা চোরাবালি থেকে, ন-খানা! শয়তান, এতগুলো লোক খুন করেছিস তুই?" চার্লির স্বরে ঘৃণার বদলে উপচে পড়ছিল বিষ।

আমি তো অবাক! বলার চেষ্টা করলাম, "এ কি চার্লি, খিস্তি করছ কেন? তোমাকে তো আমার বন্ধু বলেই জানতাম।"

থুতু ছেটাতে ছেটাতে দূরে সরে গেল চার্লি, "আমাকে তোর বন্ধু বলে ডাকার হিম্মত হল কী করে? তোকে রাস্তার কুত্তার মতো পিটিয়ে মারা উচিত। শেরিফ যে কেন লোকগুলোকে থানার বাইরে আটকে রেখেছে কে জানে। তোর মতো নরকের কীটদের ওদের হাতেই ছেড়ে দেওয়া উচিত। ওটাই তোর উচিত শাস্তি।" বলতে বলতে থানার তালা লাগাচ্ছিল চার্লি। বন্ধ হয়ে যাওয়া দরজার ওপার থেকে ছিটকে আসছিল ওর উগরে দেওয়া কথাগুলো।

থানার দরজাটা বন্ধ হয়ে গেলে অনুভব করলাম যে আমি একা। সারা জীবনে এই প্রথম। এমনকি ও-ও নেই আমার সঙ্গে।

মাথায় একবার হাত বুলিয়ে দিলাম। কেউ কোথাও নেই। কিচ্ছু নেই।

জানালার গরাদের ফাঁক দিয়ে চাঁদের বিষণ্ণ আলো এসে পড়ছিল সেলের মেঝেতে। বাইরে রাত আরও গভীর হয়ে এসেছে। আমি স্থির তাকিয়ে ছিলাম মেঝের ওপর আলোর কাটাকুটি খেলা দেখার জন্য। ও চাঁদের আলো খুব পছন্দ করত, পূর্ণিমার রাতে যেন পাগল হয়ে যেত। তখন আমার মাথার ভেতরে ওর সেই উন্মত্ত ফিসফাস বিষের মতো খেলা করে বেড়াত।

ও কেমন আছে এখন? ক্যাসিডির সঙ্গে?

জানি না কতক্ষণ ওভাবে বসেছিলাম। আমার সারা শরীরে, শিরায় উপশিরায় কেমন যেন একটা অলস, ভোঁতা বিষাদ ছড়িয়ে পড়ছিল।

আমার সাড় ফিরে এল একটা শব্দে। কে একজন যেন থানার দরজাটা খুলছে।

আমি উঠে দাঁড়ালাম, ওরা আসছে না তো? চার্লি লোকজন নিয়ে আসছে না তো আমাকে পিটিয়ে মেরে ফেলবে বলে?

না, চার্লি না। আবছায়ার মধ্যেই বুঝলাম দ্রুত পায়ে কে এসে আমার সেলের দরজাটা খুলল।

ক্যাসিডি।

"ও... ও... ওকে নামাও, নামাও আমার মাথা থেকে," ত্রস্ত স্বরে বলল ক্যাসিডি, "এক্ষুনি ফিরিয়ে নাও ওকে, এক্ষুনি।"

আশ্চর্য হলাম আমি, এই তো এইমাত্র ওকে নিয়ে গেল লোকটা। এর মধ্যেই কী হল?

"কী হয়েছে? ওরকম করছ কেন?"

"নিয়ে যাও, নিয়ে যাও ওকে।" হাঁপাতে হাঁপাতে বলল ক্যাসিডি, "আমি ওকে চাই না, একমুহূর্তের জন্যও না।"

"কেন? আমি তো বলেই ছিলাম ও কেমন, কী করে, কী চায়..."

"ও রক্ত চাইছে, রক্ত," বিস্ফারিত স্বরে বলল ক্যাসিডি, "আ... আ...আমি শুনতে পাচ্ছি ওর কথা। আমার ঘাড় বেয়ে উঠছে ও... উফফফ্.... কী যেন একটা বলছে আমার কানে কানে..,"

"আমি তো বলেছিলাম তোমাকে", ঠান্ডা স্বরে বললাম আমি, "বলেছিলাম যে ও কী চায়। ও যা চায় এবার তো ওকে সেটা দিতে হবে তোমায়।"

"না না, পারব না," আর্তনাদ করে উঠল ক্যাসিডি, "আমি কিছুতেই মানুষ খুন করতে পারব না। ওকে নিয়ে যাও। দোহাই, পায়ে পড়ি তোমার, ওকে নিয়ে যাও..."

"ঠিক আছে, যখন বলছ, আমি না হয় ফিরিয়েই নিচ্ছি।"

ডাকলাম ওকে। একবার। দুবার। তিনবার। কিন্তু ওর কোনো সাড়া পেলাম না।

ক্যাসিডির দিকে তাকালাম। দরদর করে ঘামছে লোকটা, মুখটা আতঙ্কে আর ভয়ে বেঁকে গেছে। মনে হল কে যেন গলা টিপে ধরেছে ওর।

শ্বাসরুদ্ধ স্বরে বলল ক্যাসিডি, "না, কিছুতেই না। আমি কিছুতেই ওর কথা শুনব না।"

আমার মুখটা ক্যাসিডির কানের কাছে নিয়ে এলাম, ফিসফিস করে বললাম, "এ ছাড়া যে উপায় নেই মিস্টার ক্যাসিডি। ও যা চায়, সেটা ও আদায় করেই ছাড়ে। মায়ের সঙ্গে সেই চুক্তিই করেছিল ও। তোমার যে আর ফেরবার পথ নেই।"

"না না না..." একটা চাপা আর্তচিৎকার ভেসে এল ক্যাসিডির গলা থেকে।

তারপর লোকটা অজ্ঞান হয়ে পড়ে গেল।

আমার আর কীই বা করার ছিল। গুটিশুটি মেরে সেলের এক কোণায় গিয়ে বসলাম। চাঁদের ম্লান আলো গরাদের ফাঁক বেয়ে নেমে এসে মৃত্যুর মতো বিছিয়ে যাচ্ছিল ক্যাসিডির মুখের ওপর। আস্তে আস্তে গুটিয়ে যাচ্ছিল অত বড়ো শরীরটা।

আর ঠিক তখনই একটা বোবা আতঙ্কের কান্না, একটা চাপা গোঙানির আওয়াজ উঠে এল ক্যাসিডির গলা থেকে।

আমি জানি কী ঘটতে চলেছে এবারে। বোকা ক্যাসিডি জানত না যে ও যা চায়, সেটা আদায় করেই ছাড়ে।

হাত দিয়ে কান দুটো চাপা দিয়ে হাঁটুর মধ্যে মাথাটা গুঁজে দিলাম। কী লাভ ওসব দেখে?

কতক্ষণ ওভাবে বসেছিলাম খেয়াল নেই। চাঁদের আলো সরে গেলে আবার মাথা তুলে তাকালাম সামনের দিকে।

সেলের ঠিক মাঝখানে ক্যাসিডি শুয়েছিল। নিশ্চল। নিস্পন্দ। নিথর। নিঃশব্দ।

না, নিঃশব্দ নয়। যেখানে ক্যাসিডি শুয়েছিল, সেখান

থেকে একটা ঘরঘর আওয়াজ উঠে আসছিল। মৃদু, আরামের ঘরঘরানির আওয়াজ। ভোজ খাওয়ার পরে যেরকম তৃপ্তির শব্দ ভেসে আসে শিকারি বেড়ালের থেকে, ঠিক সেরকম।

তারপরেই ক্যাসিডির মাথার ভেতর থেকে একটা আঁচড়ানোর শব্দ ভেসে এল।

আমি জানি ওটা কীসের আঁচড়ানি।

ওটা কার নখের আওয়াজ।

ধীরে ধীরে উঠে দাঁড়ালাম। আমার মুখে একটা মৃদু হাসি এসেই পড়ল।

সেলের দরজা খোলা। থানার দরজা খোলা। আমার আর এখানে থাকার মানে আছে কোনো?

সেলের দরজা খুলে বাইরে পা রাখলাম। তারপর ঘুরে দাঁড়ালাম ক্যাসিডির দিকে। মৃদু স্বরে বললাম, "আসবে না?"

ঠিক পরমুহূর্তেই একটা শীতল নখের আঁচড় আমার ঘাড় বেয়ে উঠে এল। চেনা ছোঁয়া।

থানার দরজা খুলে রাস্তায় নেমে এলাম। চারিদিকে নিস্তব্ধতা ছড়িয়ে আছে মৃত্যুর মতো। কেউ কোথাও নেই। শুধু রয়েছে মাথার ওপর নিকষ কালো আকাশ। আর আছি আমি, আমার মাথার মধ্যে, রক্তমাংসের ডেলার মধ্যে লুকিয়ে থাকা সেই হিংস্র, ধাতব অনুভূতিটাকে নিয়ে।

ও।



জীবনদাতা

১৪ এপ্রিল, ৩০১৬:

আজ অনেকদিন পর আমার মায়ের সঙ্গে খেলতে এলাম পার্কে। তোমরা জিজ্ঞেস করতেই পারো, অনেকদিন পরে কেন? আমার মতন দশ বছরের বাচ্চার তো রোজই পার্কে আসা উচিত, তাই না? আসলে মা আমাকে নিয়ে আসতে লজ্জা পায়, তাই আর রোজ আসা হয় না। মা অবশ্য মুখে কিছু বলে না, বলতে পারার কথাও নয়। কিন্তু আমি সব বুঝতে পারি, তাই তো মা বলে আমার হেবি ব্রেইন, কোনো ইনডিউসড ইন্টেলিজেন্স এর কোর্স ছাড়াই। অবশ্য বেরোলে কেউ তেমন কিছু বলে না, সবাই সভ্য ভদ্র মানুষ, কিন্তু আমি জানি যে আমার মা চট করে বাইরে বেরোতে খুব অপ্রস্তুত বোধ করে, সে একলাই হোক বা আমাকে নিয়ে।

অবশ্য মায়ের কিন্তু-মিন্তুর কারণটা আমি জানি।

আমি আর আমার মা, আমরা কেউই কথা বলতে পারি না। শুনতে পারি, বুঝতে পারি। কিন্তু বলতে পারি না। আমরা বোবা।

এই যুগে এটা যে ভাবাই যায় না সে তো তোমরা বোঝোই। জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং-এর কোর্স তো আমাদের মতন বাচ্চাদের এখন থেকেই পড়ানো হয়। আমি অবশ্য স্কুল যাই না। মা-ই ঘরে পড়ায়। যা বলছিলাম, জেন্ট-ইঞ্জের কল্যাণে এখন কানা, খোঁড়া, অন্ধ বাচ্চা জন্ম নেয়ই না। যাদের পয়সা আছে, তারা তো কাস্টমাইজড বাচ্চা নেয়। এই তো পাশের সোসাইটির নিলসিয়েন কাকু, ডাক্তার বাচ্চা নিল। যদিও স্যামাঞ্জন মোটে জেন্ট-ইঞ্জ বোঝে না, আর মেড-লাইফ পড়ে না, তবুও। ও শুধু মেন্টালটিউবে গান শোনে।

আমি আর মা কী করে বোবা হলাম বোঝা খুব শক্ত, জান? আসলে মানুষের ডিএনএ-র সব মিস্ট্রি এখনও জানা

যায়নি নাকি, মা একদিন বলছিল। খুব অল্প কিছু পার্সেন্ট মতন নাকি এখনও ডিকোড করা বাকি আছে। তাই হঠাৎ করে দু-একটা আমাদের মতন এরকম বায়োলজিক্যালি ডিফেক্টিভ ইউনিট জন্মে যায়। তা ধরো সারা পৃথিবীতে এই মুহূর্তে ছ-জন পোলিও, এগারো জন থ্যালাসেমিয়া, জনাদশেক অন্ধ (মানে ব্লাইন্ড, সরি, মা অন্ধ বলতে বারণ করেছিল, ভুলে গেছি, হিহি), প্রায় পঞ্চাশ জন মতন অটিস্টিক বা ইমোশনালি আনস্টেবল (উফ, কী শক্ত শব্দ বাবা) লোক আছে, আর বোবা লোকজন আছে দুইজন।

আমি আর মা।

মা জানত যে আমিও ওইরকম হব, জান? আজকাল জিনম্যাপিং করানো থাকে তো সবার। তাই তো মা বিয়ে-টিয়ে করেনি। কিডস ফ্যাকটরি থেকে আমাকে বানিয়ে নিয়ে এসেছিল। সেখানে নাকি আমার বাবার ভালোবাসা ডিপকোল্ডস্পেসে ছিল, ছোট্ট একটা টিউবে। সেটাকে মায়ের পেটে বসিয়ে দিতেই নাকি আমি হই, হিহি। কি কিউট না স্টোরিটা? তবে মা কিছুতেই বাবার সঙ্গে দেখা করতে দেয় না। বলে বাবা নাকি হারিয়ে গেছে, মিথ্যে বলে মা, তাই না?

ও, একটা মজার কথা তো বলাই হয়নি তোমাদের। আমি আর মা নিজেদের মধ্যে কী করে কথা বলি বলো তো? হাত আর ঠোঁট নেড়ে, কী মজা না? অবশ্য অন্য লোকেদের জন্যে হ্যান্ডট্যাব থাকেই, তাতেই নিজেদের মনের কথা বাঁ হাতের চামড়ার স্ক্রিনে ফুটে ওঠে, আর সামনের লোকের কথাও ফুটে ওঠে। তবে ওরকম একটা গ্যাজেট হাতে বেঁধে ঘোরাটা ব্যাড লাগে না? বোবা লোকও আর দেখা যায় না, তাই এসবের ব্যবহার উঠেই গেছে। আমার জন্যে তো হ্যান্ডট্যাব পাওয়াই যাচ্ছিল না। শেষে সায়েন্স অ্যান্ড টেক মিউজিয়ামের কিউরেটর অনেক পুরোনো ফাইল রিডিকোড করে, হিস্টরিলিসিস করে

এটা বানিয়ে দিয়েছেন। এটা অন করে বেরোলেই লোকে বোঝে যে আমরা কথা বলতে পারি না। আর কেমন করে যেন তাকায়, এইসান রাগ ধরে না। কিছু বলে না যদিও, ভদ্রসভ্য লোক সব্বাই। আর বেশি অবাক হওয়াটা ব্যাড ম্যানার্স, মা বলেছে। তবুও লজ্জা লাগে না? তাই তো মা বেশি বেরোয় না। না একা, না আমাকে নিয়ে।

আগেই বলেছি না, যে আমি আমার মা বাড়িতে হাত আর ঠোঁট নেড়ে কথা বলি? অ্যানশিয়েন্ট টাইমে যারা আমাদের মতন ছিল, তারা নাকি এই ভাবেই কথা বলত। একে বলে সাইন ল্যাঙ্গুয়েজ, প্রিহিস্টোরিক যুগে নাকি এসব শেখাবার স্কুল ছিল। হ্যান্ডট্যাবের যুগে সেসব বন্ধ হয়ে যায় আগেই। মা অনেক অ্যানশিয়েন্ট স্ক্রিপচার ডেটামেমরিড করিয়ে এগুলো শিখেছে, আর আমাকে শিখিয়েছে। আমরা ছাড়া এই ল্যাঙ্গুয়েজ আর কেউ জানে না। সমস্ত ওল্ড স্ক্রিপচার্স মায়ের কাছেই। আর কেউ শিখতেও পারবে না, হিহিহি, মজার না?

ওই দ্যাখো মা ডাকছে, লিলিতা আন্টি হেসে হেসে কী যেন বলছে মাকে। যাই দেখে আসি।

৩০ জুলাই, ৩০১৬:

আজ আমার মনখারাপ। মা বকেছে। স্কুলে ভরতি করতে যেতে কে বলেছিল বল? বাড়িতেই পড়ছিলাম তো দিব্যি। স্কুল থেকে যদি বলে যে ডিফেক্টিভ চাইল্ডদের জন্যে ওরা সিলেবাস পালটাতে পারবে না, সেটা কি আমার দোষ? মা-টাও কী বোকা দেখো। উইন্ডোশিল্ড খুলে বৃষ্টি দেখছে আর কাঁদছে। মা কাঁদলে আমার ভালো লাগে, বল? যাই, মাকে একটু আদর করে আসি কেমন?

১ জানুয়ারি, ৩০২২:

আর-একটা ক্লান্তিকর নিউইয়ার। আবার সেই একঘেয়ে ননসেন্স নাচগান, চেঁচামেচি, হেঁড়ে গলায় হল্লা। আজকাল একটু বিরক্তিকরই লাগে। তাও নিজেরা আয়োজন করলে বুঝতাম। এখন সব উৎসবই কান্ট্রি, স্টেট বা লোকাল এরিয়া কমান্ডের আয়োজনে হয়। সেখানে লোকজন হাস্যকর রকমের লোক দেখানো আনন্দ করে। দেখে রাগও ধরে, হাসিও পায়।

হিস্ট্রিতে পড়েছি যে পাঁচশো বছর আগের বিশ্বযুদ্ধে পৃথিবী ধ্বংস হয়ে যাবারই কথা ছিল। এই ছোট্ট গ্রহটাকে উড়িয়ে দিতে কী লাগে, দু-তিনটে ট্রাইনিট্রিয়াম বোমা ছাড়া? সৌভাগ্যবশত যারা যুদ্ধ করছিল, রুশেশিয়ান কনফেডারেট আর ইউরোমেরিকা অ্যাক্সিস, কেউই অতদূর যায়নি। তবে ক্ষয়ক্ষতি কম হয়নি, পৃথিবীর অর্ধেকের বেশি লোক মারা যায়। তারপর না খেয়ে আর মহামারিতে উজাড় যায় আরও বেশ কিছু দেশ। আর ততদিনে সমুদ্রের জল বেড়ে আইসল্যান্ড আর গ্রিনল্যান্ড জলের তলায়, দক্ষিণ ইউরোপিয়ান ল্যান্ডপ্লেসও তাই। তবে রুশেশিয়ারও ক্ষতি কম হয়নি। সাউথ-ইস্ট এশিয়ার প্রায় পুরোটাই জলের তলায় ভেসে যায়, শুধু তাতেই সত্তর কোটির কাছাকাছি লোক মারা গেছিল। সব মিলিয়ে বড়ো কর্তাদের বড়ো ধরনের টনক নড়ে। ফলে তখন সব বড়ো বড়ো নামকরা রাজনৈতিক নেতারা নিজেদের মধ্যে বসে এই সেন্ট্রাল কমান্ডের ব্যাপারটা চালু করতে বাধ্য হয়।

এই সেন্ট্রাল কমান্ডের হেডকোয়ার্টার প্রাচীন শহর জেরুজালেম।

সেই থেকে সারা পৃথিবীজুড়ে এখন শাসন করে সেন্ট্রাল কমান্ড। তাদের বিপুল প্রতাপ, ঈশ্বর বললেই চলে। তার অধীনে কন্টিনেন্ট কমান্ড, আবার কন্টিনেন্ট কমান্ডের অধীনে

কান্ট্রি কমান্ড। এই হতে হতে শহর জুড়ে সিটি কমান্ড আর তাদের অধীনে কয়েকটা করে লোকাল কমান্ড। দেশবিদেশ বলে কিছু নেই, তাই সেনাবাহিনী বলে কিছু নেই। শুধু আইনশৃঙ্খলা রক্ষাবাহিনী আছে, লোকপ। তাদের দাপট দেখলে অবশ্য মাঝেমধ্যে বেশ রাগই ধরে।

মজাটা হল কী, সেই থেকে জীবনযাত্রার বেশ কিছু অংশ আর আমাদের হাতে রইল না, কমান্ডের হাতে চলে গেল, যেমন বিভিন্ন উৎসব, জীবনযাত্রার ন্যূনতম উপকরণ ইত্যাদি।

আর পৃথিবীর সবাইকে আয়, সামর্থ্য, ক্ষমতা, কমিউনিটিতে তাদের অবদান ও প্রয়োজন ইত্যাদি দেখে চার ভাগে ভাগ করে ফেলা হল, সাবনর্মাল, নর্মাল, প্রিভিলেজড আর সুপার। প্রত্যেকের কাছে সেই অনুযায়ী কার্ড আছে। এই ডিজিটাল কার্ড ছাড়া বেঁচে থাকাই মুশকিল। এটাই এখন সবার আইডেন্টিটি, সবার পরিচয়।

যেমন ধরুন আমি আর মা, আমাদের কার্ড সাবনর্মাল। আমাদের কি আর সাধ্য আছে যে দোকানে গিয়ে ইচ্ছেমতন যা কিছু কিনব? না হোটেলে গিয়ে খাব? আমরা হলাম সাবনর্মাল কার্ড হোল্ডার, সাবহিউম্যানদের মতোই প্রায়। নর্মাল কার্ড হোল্ডার আর আমরা, আমরা কেউ ই-র‍্যাশনের বাইরে কেনাকাটা করতে পারি না। নিজেদের পছন্দমতো কিছুই কিনতে পারি না, সে পছন্দের বডিক্লিন জেল হোক বা সোলসাইকেল, কি হোভারকার। আমাদের পড়াশোনা লোকাল এডুসেন্টারে, মেডিসার্ভিস হয় লোকাল হেলথ পয়েন্টে। জামা জুতো থেকে শুরু করে র‍্যাশনড খাবার, বেডর‍্যাপার, বডিক্লিন জেল, সবই কমান্ড থেকে সাপ্লাই দিয়ে যায়। এমনকি খাওয়ার জল অবধি।

একদিক দিয়ে অবশ্য ভালো, না খেয়ে কাউকে মরতে হয় না।

আর যাদের প্রিভিলেজড বা সুপার কার্ড আছে? আহা তারা হল গিয়ে সমাজের মাথা। তাদের জন্যেই তো সব সুবিধা গো! ইচ্ছেমতন দামি স্টাডিভার্সিটিতে পড়াশোনা করার সুবিধা, ইচ্ছেমতন খাবার সুবিধা, স্পেশ্যাল মেডিসার্ভিস, ফিবছরে স্পেশাল দামি হোভারকার, দামি জামা, জুতো, স্পেশাল সুগন্ধি বডি ফ্র্যাগ....

মাঝেমধ্যে খুব রাগ হয় কার্ডবন্দি এই দুনিয়ার ওপর। গত সপ্তাহেই আমার ষোলো বছরের জন্মদিন গেল। মা গেছিল পাশের বিল্ডিং-এর সুসাহনি ভাই এর কাছে, যদি চুপিচুপি ওর প্রিভিলেজড কার্ডটা নিয়ে আমার জন্যে একটা সস্তা মেন্টালকল কেনা যায়। এখনকারটা দশ বছরের পুরোনো কিনা!

এই নোংরা লোকটার কি অবিশ্বাস্য স্পর্ধা, মাকে বলেছে বোবা মায়ের বোবা ছেলে মেন্টালকল দিয়ে কী করবে? বরং লোকাল কমান্ডকে বলে আরও দুটো ফ্রি হ্যান্ডট্যাব চেয়ে নিই না কেন?

সারারাত মা আমাকে জড়িয়ে কেঁদেছিল। বিশ্বাস করুন, বোবা মায়ের কান্নাও আপনাদের মায়ের কান্নার মতন।

৫ জুন, ৩০২৬:

অবিশ্বাস্য! অভূতপূর্ব! অসাধারণ!

খবরটা পেলাম আজ লোকাল লাইব্রেরিতে আমার কোর্স করতে গিয়ে। লাইব্রেরিতে লোকাল এডুকম থেকে আমার জন্যে একটা থ্রিডিরিয়্যাক্টিভ কিউবিকল বানিয়ে দিয়েছে। কনসোলটা মাথা গলিয়ে পরে নিলেই হল। সব কোর্স হ্যান্ডট্যাব হয়ে ফ্যামিলি এডুমেম-এ জমা হয়ে যায়। কোর্সওয়ার্কও ওইভাবেই জমা নেয়।

আজ থ্রিডি এনক্লোজারে ঢুকতেই সে কী হইহট্টগোল!

সবাই চেঁচাচ্ছে, হাসছে, লাফাচ্ছে, একে অন্যের পিঠ চাপড়ে দিচ্ছে, সে এক অনবদ্য দৃশ্য! মনোকেল চালিয়ে আসার সময়েই অবশ্য দেখেছিলাম সব জায়গায় একটা খুশি খুশি ভাব। এমনকি আইনশৃঙ্খলা রক্ষী, মানে লোকপগুলোর পাথুরে মুখে অবধি মৃদু হাসি। ব্যাপারটা এবার বোঝা গেল!

পুরো ব্যাপারটা শুনে অবশ্য আমিও সবার মতোই খুব উত্তেজিত। আহা, জেন্ট-ইঞ্জিনিয়ার ইয়ুয়ানচন্দ্রার জয় হোক। এই যুগের তিনিই শ্রেষ্ঠ বৈজ্ঞানিক।

শুনেছি আজ থেকে হাজার বছর আগের সায়েন্সোলজাররা, যেমন আর্থার সি ক্লার্ক বা আইজাক আসিমভরা, বলেছিলেন মানুষের অন্য গ্রহে পাড়ি জমানোর কথা, সমুদ্রের তলায় থাকার কথা। যদিও এখন সেটা আমরা চাইলেই পারি, কিন্তু দরকার হয়নি। পরপর তিনটে বিশ্বযুদ্ধের ফলে এখন পৃথিবীর জনসংখ্যা দুশো কোটির বেশি না। ল্যান্ডমাস গত পাঁচশো বছরে অনেক কমে গেলেও দুশো কোটি লোকের জন্যে যথেষ্ট। যথেষ্ট ফরেস্ট প্লেসও বাঁচিয়ে রাখা আছে। মানুষ সবাই ছোটো ছোটো শহরে থাকে, সিটিসেন্টার বলি আমরা, ভিলেজগুলোতে শুধু রোবট দিয়ে চাষবাস হয়, সেন্ট্রাল কমান্ডের এগ্রিডিটি ডিপার্টমেন্টের কড়া নজরে। আগেই বলেছি, প্রায় সব রিসোর্সই র‍্যাশনড। ফলে না খেয়ে কেউ মরে না।

শুধু একটা জিনিস মানুষ পারত না।

চিরযৌবন। ইচ্ছেমতন একটা বয়সে অনেকদিন আটকে থাকা। মৃত্যুকে পিছিয়ে দেওয়ার ক্ষমতা।

এইবার সেটা পারবে!

ভাবতেই গায়ে কাঁটা দিচ্ছে। মা চিরদিনই আমার কাছে এইরকম থাকবে? ইয়াহুউউউউ। যত দামিই হোক, যতই পাউরোই লাগুক, আমাকে এই টেকনোলজি পেতেই হবে, পেতেই হবে, পেতেই হবে!

১০ জুন, ৩০২৬:

নাহ, যতটা ভেবেছিলাম, ততটা আনন্দের খবর নয়।

জেন্ট-ইঞ্জিনিয়ার ইয়ুয়ানচন্দ্রা যেটা আবিষ্কার করেছেন, সেটা এক ধরনের ইলেক্ট্রোকেমিক্যাল কমপাউন্ড। একটা প্রেশারাইজড কিউবিকলে ঢুকে একটা শট নিতে হয়। এক একটা শটে মানুষ তার বর্তমান অবস্থায় একশো বছর বাঁচতে পারে। একশো বছর পর আর-একটা শট, আরও একশো বছর। মানে যে কেউ চাইলে প্রতি একশো বছর অন্তর শট নিয়ে নিয়ে আদি অনন্তকাল বেঁচে থাকতে পারে।

এতটা অবধি ঠিক ছিল, কিন্তু এরপরেই যেটা শুনলাম তার জন্যে মোটেও প্রস্তুত ছিলাম না।

প্রচুর পাউরো ছাড়াও আরও একটি জিনিস লাগে এই লাইফশটের জন্যে,

আর-একটি মানুষের প্রাণ!

আর-একজন জীবিত মানুষের শরীর থেকে তার ইলেক্ট্রোকেমিক্যাল লাইফজিস্ট বার করে সেই নিয়েই লাইফশট তৈরি হয়। বৃদ্ধ, যুবক, পুরুষ, মহিলা, সুস্থ, নীরোগ সব চলবে, শুধু জীবিত হওয়া চাই। বলাবাহুল্য যে লাইফজিস্ট বার করে নেওয়ার পর কারও বেঁচে থাকার কোনো প্রশ্নই ওঠে না। মানে একটি প্রাণ সংহার না করে কেউ একশো বছরের বেশি তার জীবন বাড়াতে পারবে না। কেউ যদি পাঁচশো বছর বাঁচতে চাও তো পাঁচটা প্রাণ!

ল অফ কনজার্ভেশন অফ লাইফ!

আশা করি সেন্ট্রাল কমান্ড এইসব শোনা মাত্র এই সর্বনাশা আবিষ্কারের অ্যাপ্লিকেশন অ্যাপ্রুভাল প্রত্যাখ্যান করবেন। একজন মানুষের জীবনের বিনিময়ে আর-একজনের বেশিদিন বেঁচে থাকার মতন ঘৃণ্য টেকনোলোজিতে কোনো

সভ্য মানুষেরই সায় থাকা উচিত নয়।

৫ অগাস্ট, ৩০২৬:

খারাপ খবর। সারা দুনিয়া জুড়ে এত অনুরোধ উপরোধ সব বিফলে গেল। সেন্ট্রাল কমান্ডের টেকঅ্যাড কমিটি পৃথিবীজোড়া অসন্তোষ উপেক্ষা করে লাইফশটকে বৈধ ঘোষণা করেছে! লেখাটা লিখে আমি নিজেই বিশ্বাস করতে পারছি না। অন্যের প্রাণ কেড়ে নিজের বিলাসী জীবন কৃত্রিমভাবে বাড়িয়ে ভোগ করার এই জঘন্য বর্বর স্বার্থপর আবিষ্কার এরা অ্যাপ্রুভ করল কী করে? মানবতাবাদ বলে কি আর কিছুই অবশিষ্ট নেই?

ইঞ্জিনিয়ার চন্দ্রাকে দোষ দিই না, উনি বৈজ্ঞানিক, বোধহয় গত হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বৈজ্ঞানিক। ওঁর কাজ আবিষ্কার করার, আবিষ্কার করেছেন। সেন্ট্রাল কমান্ডের প্রধান অ্যাডমিনিস্ট্রেটররা কী করছেন? তাঁরা না বিশ্বনেতা? ফার্স্ট কমান্ডেন্ট গোয়েলস্ফাইন কী করছেন? তিনি তো আক্ষরিক অর্থেই পৃথিবীর দণ্ডমুণ্ডের কর্তা। তাঁকে তো ভালো লোক বলেই জানতাম। তিনিও চুপ করে আছেন?

সোশ্যালপ্লেস মাইন্ডবুক ভেসে যাচ্ছে ছিছিক্কারে, বিদ্রুপে আর কমিকস্ট্রিপে। সারা দুনিয়া জুড়ে মাইন্ডবুকে ঝড় উঠেছে বুঝতে পারছি। যাই, একবার কলইন করে দেখি, কেসটা কী?

২৯ সেপ্টেম্বর, ৩০২৬:

ব্যাপার আরও ঘোরালো হয়ে উঠেছে।

আজ খবরে প্রকাশ দুনিয়ার সবচেয়ে বড়ো ওষুধের কোম্পানি মেড্র্যাগন এই আবিষ্কার কিনে নিয়েছে। আরও বড়ো

খবর হল যে সই করার পর থেকেই ইঞ্জিনিয়ার চন্দ্রাকে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। না তাঁর বিলাসবহুল লাইভমেন্টে, না তাঁর ওয়ার্কস্পেসে। লোকপবাহিনীর টপঅপস ডিভিশন নামানো হয়েছে ওঁর খোঁজে।

এদিকে মাইন্ডবুকে ছিছিক্কারে আর কান পাতা যাচ্ছে না। প্রায় সবাই মনে করছে মেড্র্যাগন আর সেন্ট্রাল কমান্ড মিলে গুম করেছে লোকটাকে। বিপুল পাউরো ঢেলেছে নাকি মেড্র্যাগন, এই লাইফশট টেকনোলজি কেনার জন্যে। যাতে করে ম্যাজিশিয়ান চন্দ্রা পরে আর কোনোভাবেই না বাগড়া দিতে পারেন, তার এরা আর ঝুঁকি না নিয়ে লোকটাকে হাপিস করে দিয়েছে।

ওদিকে মা ডাকছে, ওয়ার্ল্ডভিশনে সেন্ট্রাল কমান্ডের নতুন কী সম্প্রচার শুরু হবে যেন। যাই, শুনে আসি।

৩০ সেপ্টেম্বর, ৩০২৬:

সারা দুনিয়া স্তব্ধ। এরকমও হয়? ছিঃ। নিজেকে মানুষ বলতে আর ইচ্ছে করছে না।

মেড্র্যাগন ঘোষণা করেছে যে তারা সেন্ট্রাল কমান্ডের সমস্ত কমান্ডেন্টদের ফ্রিতে লাইফশট দেবে। তারপর সমস্ত সিটিজেনদের জন্য এই 'সুবিধা' দেওয়া শুরু হবে। তবে যথারীতি প্রিভিলেজড আর সুপার কার্ড প্রাপ্তদের অগ্রাধিকার দেওয়া হবে। তারা কোথা থেকে জীবনদাতা আনবে সেটা তাদের ব্যাপার। কী নির্লজ্জ ঘুষখোরদের কাজকারবার!

এতেই শেষ নয়।

সেন্ট্রাল কমান্ড ঘোষণা করেছে তাদের কমান্ডেন্টদের জন্যে লাইফজিস্ট নেওয়া হবে মৃত্যুদণ্ডাজ্ঞা পাওয়া আসামিদের থেকে! এবং এখানেই আমার তীব্র আপত্তি আছে। এদের

মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হয়েছিল এদের অপরাধের শাস্তি হিসেবে। এদের প্রাণ কি সেন্ট্রাল কমান্ডের ব্যক্তিগত সম্পত্তি নাকি? কী নৃশংস, কী নির্মম, কী হৃদয়হীন পাষণ্ড এরা!

তবে এর বিনিময়ে নাকি সেই অভাগাদের পরিবার পরিজনদের এককালীন কিছু পাউরো ধরিয়ে দেওয়া হবে। আহা, কর্তাদের দয়ার প্রাণ!

মাইন্ডবুক পুরো ফুঁসছে, দিকে দিকে এই সেন্ট্রাল কমান্ডের বিরুদ্ধে ক্ষোভ উগরে দেওয়া চলছে। ওয়ার্ল্ডভিশনেও ইতিউতি বিক্ষোভের খবর পাওয়া যাচ্ছে। লোকপগুলো অবশ্য বিরামহীন ভাবে পেটানোর জন্যে বিখ্যাত।

১৫ নভেম্বর, ৩০২৬:

আজ লাইফশটের প্রথম সার্থক প্রয়োগ হল। নিলেন ফার্স্ট কমান্ডেন্ট গোয়েলস্ফাইন। তাঁকে অবশ্য খুবই অসুস্থ ও কৃশ দেখাচ্ছিল। লাইফশট নেওয়ার পর উনি পৃথিবীর সবার শুভ বুদ্ধির উপর আস্থা রেখে এবং বিজ্ঞানের বিপুল অগ্রগতি কামনা করে ভাষণ দিলেন।

অসুস্থ লাগছে। মা আজ সারাদিন কিছু খায়নি, চুপচাপ শুয়ে আছে। দেখি কিছু খাওয়ানো যায় কিনা। আমারও খেতে ইচ্ছে করছে না যদিও।

আজকের দিনটা মানবসভ্যতার ইতিহাসে নিশ্চিত ভাবে একটা কালো দিন হিসেবে চিহ্নিত হয়ে থাকবে।

১৫ নভেম্বর ৩০৩১:

আজ লাইফশট টেকনোলোজির পাঁচ বছর হল। প্রতি সপ্তাহে একজন করে কমান্ডেন্টকে দিয়ে দিয়ে প্রায়

আড়াইশো জনের সেন্ট্রাল কমান্ডেন্টবাহিনী আজ সম্পূর্ণ ভাবে লাইফশটেড। মৃত্যুদণ্ড পাওয়া আসামিও আর কেউ নেই। তাদের 'স্যাক্রিফাইটার' উপাধি দেওয়া হয়েছে।

নাহ। কোত্থাও কোনো ঝুটঝামেলা নেই। মাইন্ডবুক এখন অন্য কিছু নিয়ে চঞ্চল। ওয়ার্ল্ডভিশনে এখন স্ট্রোবো খেলার নতুন সিজনের কম্পিটিশন সম্প্রচার চলছে।

আকাশ নীল। মৃদু হাওয়া বইছে। নীচে বাচ্চারা খেলছে। মা বোধহয় কার সঙ্গে কথা বলছে। অনেকদিন পর মাকে হাসতে দেখলাম। আকাশে-বাতাসে পরম শান্তি।

ইঞ্জিনিয়ার চন্দ্রাকে আজও খুঁজে পাওয়া যায়নি।

আজ রাতে ওয়ার্ল্ডভিশনে সেন্ট্রাল কমান্ডের নতুন কী একটা ঘোষণা আছে। দেখি কী বলে।

১৬ নভেম্বর, ৩০৩১:

সারা পৃথিবী রাগে ফুঁসছে। কাল রাত থেকেই বিভিন্ন জায়গায় বিপুল পরিমাণে লোকপ মোতায়েন করা হয়েছিল, কিন্তু তাতেও আটকানো যাচ্ছে না। লেজারশক, লাইটক্যানন, উইন্ডব্লাস্ট, কিছুতেই আটকানো যাচ্ছে না উগ্র হয়ে পড়া প্রতিবাদীদের।

কাল রাতে সেন্ট্রাল কমান্ড জানায় যে এবার থেকে সমস্ত সুপার কার্ড হোল্ডারদের লাইফশট দেওয়া হবে। এবার থেকে আর সপ্তাহে একজন নয়। রোজই দেওয়া হবে। আপত্তি তাতেও ছিল না। ঘোষণার পরবর্তী অংশ শুনেই আগুন জ্বলে ওঠে।

সেন্ট্রাল কমান্ড ঘোষণা করেছে যে এবার থেকে সুপার কার্ড হোল্ডারদের জন্যেও জীবনদাতা সেন্ট্রাল কমান্ডই জোগাড় করে দেবে। আর জীবনদাতা জোগাড় হবে যেসব লোক ডেথ

উইশলিস্টে নাম লিখিয়েছেন, বা যাঁদের আর বাঁচার আশা নেই এমন লোকেদের মধ্যে থেকে। পরে আর কাদের কাদের এই তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করা যায় তা বিবেচনা করে দেখা হবে!

মানে পাঁচ বছর আগে যা ঘোষণা করা হয়েছিল তা আর বৈধ রইল না! সুপার কার্ড হোল্ডাররা কমিউনিটির বড়ো বড়ো মাথা, তাঁদের জীবনদাতা খুঁজে বেড়াবার মতন তুচ্ছ কাজে ব্যস্ত থাকলে চলে? সদাশয় সেন্ট্রাল কমান্ডই সেই গুরুদায়িত্ব নিজেদের ঘাড়ে তুলে নিয়েছেন!

ব্যক্তিগত স্বার্থে কমিউনিটির সার্বিক ক্ষমতা ব্যবহার করার এরকম নির্লজ্জ অপচেষ্টা শেষ কবে হয়েছে কে জানে! সেন্ট্রাল কমান্ডের কমান্ডান্টদের লাইফশট দেওয়ার জন্যে জীবনদাতা খুঁজে দেওয়াটা তাও মানা যায়, হাজার হোক তাঁরা সিটিজেন কমিউনিটির মাথা। সেন্ট্রাল কমান্ড কারও একার নয়, সবার। কিন্তু এটা কী? কীসের খেলা চলছে পর্দার আড়ালে?

৩১ মার্চ, ৩০৩৯:

কাল রাতে পিতরসেফাস এসেছিল, রেজিস্টেন্সের একজন মেম্বার। অনেক কোডেড আলোচনা হল। হ্যান্ডট্যাবে নয়, লিখে। সেন্ট্রাল কমান্ডের নজর এড়িয়ে এখন কোনো ডিজিকমে এইসব আলোচনা চলতেই পারে না। অগত্যা প্রাগৈতিহাসিক পদ্ধতিই ভরসা।

গত আট বছর ধরে সেন্ট্রাল কমান্ড আরও বিভিন্ন আইনকানুন জারি করেছে, যার মূল উদ্দেশ্য খুব স্পষ্ট। এই বর্তমান সেন্ট্রাল কমান্ড আজীবন এই ক্ষমতা ভোগ করে যেতে চান, লাইফশট ছিল তার প্রথম পদক্ষেপ মাত্র। এর পরপরই সেন্ট্রাল কমান্ডকে অপরিবর্তনীয় ঘোষণা করা হয়েছে, ভোটাভুটি নিষিদ্ধ করা হয়েছে। গ্লোবাল অ্যাডভাইজরি

কমিটিতে শুধুমাত্র কর্তাভজা কিছু সুপার কার্ড হোল্ডারদের নেওয়া হয়েছে। বাকিদের সমস্ত প্রকার ভোটাধিকার নিষিদ্ধ।

এর বিরুদ্ধে বিভিন্ন জায়গায় সেন্ট্রাল কমান্ডের বিরুদ্ধে গোপনে বিদ্রোহীরা সংগঠিত হতে শুরু করেছে। কয়েক জায়গায় বিক্ষিপ্ত হামলাও হয়েছে। জবাবে আরও প্রতিশোধপরায়ণ হয়েছে সেন্ট্রাল কমান্ড, আরও হিংস্র। সেন্ট্রাল কমান্ডের চোখে এখন যাবতীয় অবাধ্যতা আর বিদ্রোহের একটাই শাস্তি, মৃত্যুদণ্ড!

এইসব মৃত্যুদণ্ড যাতে দ্রুত কার্যকর করা যায় তার জন্যে বিশেষ জাস্টিস কোর্টও বসানো হয়েছে। কে না জানে, মৃত্যুদণ্ডাজ্ঞা প্রাপ্ত আসামিদের তো একটাই ভবিতব্য, অনিচ্ছুক জীবনদাতা হওয়া।

আমাদের এই এলাকার রেজিস্টেন্সে আমাকে বাদ দিয়ে আরও বারো জন আছে। যেমন এই পিতরসেফাস, তারই ভাই আঁদ্রুসেফাস, আলফাপুত্ত, ইয়ুদাসিওট ইত্যাদি।

পিতরসেফাস বেরিয়ে যাচ্ছিল আলোচনা শেষে। এমন সময় ওর মেন্টালকলে মেরিডিলিওনের ফোন, "এক্ষুনি ওয়ার্ল্ডভিশন খোলো, সেন্ট্রাল কমান্ডের নতুন আদেশ", বলেই ফোন কেটে দিল।

দ্রুত হাতে ওয়ার্ল্ডভিশন অন করল পিতরসেফাস।

দশ মিনিটের একটা মেসেজ। বুঝে গেলাম, আমার আর আমার মায়ের বেশিদিন আর নেই।

১৪ এপ্রিল, ৩০৩৯:

আমি আর মা চুপ করে বসে আছি। ঘর অন্ধকার করে।

মা আমার হাত ধরে আছে। মায়ের এই ছোঁয়াটা আমি চিনি। মা বলতে চাইছে খোকা ভয় পাস না, আমি আছি তো।

কিন্তু আমি জানি এবার শুধু মা কেন, কারও পক্ষেই কিছু করা আর সম্ভব না।

গতকালের ঘোষণায় সেন্ট্রাল কমান্ড বলেছে যে এবার থেকে সমস্ত জন্মগত ভাবে শারীরিক ত্রুটিযুক্ত লোকজনকে "সমাজের পক্ষে অবাঞ্ছনীয় বলে ধরা হল এবং তাদের জীবনদাতাদের সম্ভাব্য লিস্টে গণ্য করা হবে"। মানে একক ধাক্কায় আমাদের মতন সত্তর-আশি জন জন্ম থেকেই শারীরিক প্রতিবন্ধী লোকজন জীবনদাতা হিসেবে চিহ্নিত হয়ে গেলাম আর কী! কারণ আমরা সমাজের বোঝা! আমাদের থাকা না থাকার কোনো মূল্যই নেই, আর যদি থাকেও বা, তাতে কার কী এসে যায়?

১ জুন, ৩০৩৯:

তিরিশ জন, তিরিশ জন মানুষ। জোয়ান-বুড়ো, ছেলে-মেয়ে, ওয়েস্টার্ন হেমিপ্লেসের কি ইস্টার্ন হেমিপ্লেসের। এদের মধ্যে দুটোই মিল। এক, এরা সবাই শারীরিক ভাবে প্রতিবন্ধী ছিলেন, আর দুই আজ এঁরা কেউ বেঁচে নেই।

লোকাল রেজিস্টেন্সের সবাই অবশ্য অনেকবার বুঝিয়েছিল। সারা পৃথিবীজোড়া সেফআউটস আছে ওদের। বলেছিল পালিয়ে যেতে, যদ্দিন এই রাক্ষসদের হাত এড়িয়ে থাকা যায়। আমি শুনেই নাকচ করে দিয়েছি। মায়ের বয়স হয়েছে, এই পলাতকের জীবন বেশিদিন সহ্যই করতে পারবে না। আর আমারও তেত্রিশ বছর বয়স হল। এই বোবা জীবন নিয়ে কতদিন আর পালিয়ে বেড়াব? আর এই দুই বোবা মা-ছেলের জন্য রেজিস্টেন্সকে এত ঝুঁকির মধ্যে ফেলাটাও কোনো কাজের কথা নয়।

দরজায় কেউ সিগন্যাল দিচ্ছে। দেখি কে এল।

১৩ জুন, ৩০৩৯:

সেদিন আলসেবিদিয়াস এসেছিলেন, ইস্ট ইন্ডিয়ানা ল্যান্ডের লোকপ বাহিনীর হেডকপ।

এমনিতে লোক ভালো। মুখে যেন মধু ঝরছে সবসময়। এসে আমি কেমন আছি, মা কেমন আছেন, ইত্যাদি দু-একটা খেজুরে আলাপের পর দ্রুত আসল প্রসঙ্গে ঢুকে গেলেন। প্রসঙ্গটা অবশ্য আন্দাজ করতে আমার অসুবিধা হয়নি। শুধু ভাবছিলাম এত সাবধানতা নেওয়া সত্ত্বেও এরা জানল কী করে?

এনার কথাতেই অবশ্য উত্তরটা পেয়ে গেলাম। সেদিন যে কাগজের টুকরোটায় আমি আর পিতরসেফাস কথা লিখে রাখছিলাম, সেটা পোড়ানোর বদলে ছিঁড়ে ময়লা ফেলার ব্যাগে ফেলা হয়েছিল, সেটাই কাল হল। এরা অনেকদিনই তক্কেতক্কে ছিল, কাগজের টুকরোটাকরাগুলো নিয়ে পাজল ডিকোড করতে ওদের কম্পিউটার বোধহয় সেকেন্ডের ভগ্নাংশের বেশি সময় নেয়নি।

অনেক ধানাইপানাই করে যখন বুঝলেন যে এতে চিঁড়ে ভিজবে না, তখন একটা টোপ ফেললেন, যদি রেজিস্টেন্সের বাকি মেম্বার্সদের নামঠিকানা বলে দিই, তবে আমার আর আমার

মায়ের নাম জীবনদাতার লিস্ট থেকে বাদ দেওয়া হবে!

আমি বোধহয় একটু জোরেই হেসে ফেলেছিলাম। তেত্রিশ বছর বয়সি একটা ছেলে এইরকম শিশুভোলানো কথা বিশ্বাস করে দলের সঙ্গে বেইমানি করবে, এটাও যে উনি ভাবতে পেরেছেন দেখে হাসিই পাচ্ছিল। মাকে সাইন ল্যাঙ্গুয়েজে বললাম কথাটা। মা সাইন ল্যাঙ্গুয়েজেই জবাব দিল,

"এই জন্তুটাকে যেতে বল, ঘরে দুর্গন্ধ ছড়াচ্ছে।"

ভদ্রলোক খানিকক্ষণ জুলজুল করে দেখলেন, তারপর জিজ্ঞেস করলেন যে হাত-পা-ঠোঁট নেড়ে আমরা কী করছি? আমিও সাইন ল্যাঙ্গুয়েজের কথাটা বলে দিলাম। ইনি বোধহয় সাইন ল্যাঙ্গুয়েজের নামই শোনেননি, শোনার অবশ্য কথাও নয়। খানিকক্ষণ ভ্রূ কুঁচকে থেকে ফের স্বাভাবিক গলায় সেই একই প্রশ্নে ফিরে গেলেন। আমার এবার বেশ বিরক্ত লাগছিল। ফলে একটু কড়া করেই বলতে হল যে কোনো ধরনের রেজিস্টেন্সের সঙ্গে আমার কোনোদিনই কোনো সম্পর্ক ছিল না। ওই কাগজের টুকরো ওঁরা কোত্থেকে পেয়েছেন সে নিয়ে আমার কোনো আইডিয়া নেই। আমি কোনোরকম ভাবে কোনো হেল্প করতে পারব না।

ভদ্রলোক চলে গেলেন বটে, কিন্তু যে চাউনিটা দিয়ে গেলেন, সেটা সুবিধার নয়।

২৯ জুন, ৩০৩৯:

অনেক্ষণ পর বহুকষ্টে বাঁ চোখটা খুলতে পারলাম। সারা শরীরে ব্যথার ছোবলে টাটিয়ে আছে। হাঁটু আর কনুইগুলোতেই মেরেছে বেশি, সামান্য নড়াচড়াতেই মনে হচ্ছে মরে যাব। ঠোঁটের বাঁ-দিকটা ফেটেছে বিশ্রী ভাবে, সে বুঝতেই পারছি। জিভে নোনা ঠেকছে এখনও।

মাকে ওরা কাল নিয়ে গেছে, কোনো এক বড়োলোক ট্রেডিং মাস্টারের স্ত্রীর লাইফশটের জন্যে। আমরা অবশ্য তৈরিই ছিলাম, কিন্তু ঘটনাটা এত দ্রুত ঘটবে, বুঝিনি। আমি সাধ্যমতো মারপিট করেছিলাম অবশ্য, ফলাফল তো সারা শরীরে। ষোলোজন সশস্ত্র লোকপের সঙ্গে পেরে ওঠার কথাও ছিল না।

শুধু মাথার পেছনে লেজারশকটা খেয়ে যখন পড়ে যাচ্ছি, তখন অজ্ঞান হওয়ার ঠিক আগের মুহূর্তে মায়ের চোখে চোখ পড়ে গেছিল। দেখলাম, সেই চোখে নিজের জন্যে মায়ের একটুও ভয় নেই, শুধু আমাকে মার খেতে দেখার কষ্ট আর আতঙ্কটা আছে।

তোমাকে আর দেখতে পাব না, তাই না মা? এতক্ষণে বোধহয় তুমি মরেও গেছ, তাই না? খুব কষ্ট হয়েছিল গো মা? ব্যথা লেগেছিল?

দুঃখ কোরো না মা, আমিও আসছি। বেশিদিন আর নেই।

১ জুলাই, ৩০৩৯:

আজ মাকে শেষবারের মতন দেখলাম, ক্রিমেশন স্টেশনে। সাদা ডেথস্যুটে ঢাকা শরীরে শুধু মুখটুকু জেগে আছে আমার বুড়ি মায়ের। অসীম প্রশান্তির চিহ্ন সারা মুখে। আহা, কত কথাই না বলার ছিল মায়ের সঙ্গে, কত কথাই আর বলা হল না। আর কখনও বলা হবেও না।

একটু পরেই মায়ের বডিটা জ্বলন্ত ক্রিমেশন ওভেনে ঢুকে যাবে। ছাই হিসেবে যেটুকু থেকে যাবে উড়িয়ে দেওয়া হবে কাছের কোনো ফরেস্টপ্লেসে।

আজ আমি কাঁদছিলাম, হাউহাউ করে কাঁদছিলাম। লোকপগুলো পাথরের মতন মুখ করে দাঁড়িয়েছিল। বোবা মানুষের কান্না, কেই-বা আর শোনে?

১০ সেপ্টেম্বর, ৩০৩৯:

এরা বোধহয় ভেবেছে আমি পালিয়ে যাব। চারিদিকে

লোকপ বসিয়ে রেখেছে পাহারা দিতে। র‍্যাশন কালেক্ট করতে গিয়ে সেটা টের পেলাম।

র‍্যাশন নিয়ে ফিরে আসছি, দেখি উত্তরের আকাশ কালো হয়ে আসছে। মেঘ নয়, মানে মেঘের কালো নয়। যেন আকাশটাই কেউ দখল করে নিচ্ছে। কী জানি কী বিষয়বৃত্তান্ত।

১৫ সেপ্টেম্বর, ৩০৩৯:

অ্যালিয়েন অ্যাটাক! পৃথিবীর ওপরে! আতঙ্কে থরথর কাঁপছে সারা পৃথিবী।

সেদিন উত্তরের আকাশ যে কালো হয়ে উঠতে দেখেছিলাম, ওটা আর কিছু নয়। অ্যালিয়েন স্পেসশিপ আস্তে আস্তে দৃশ্যমান হচ্ছিল। টাইমস্পেস বাঁকিয়ে ওয়র্মহোল তৈরি করা, যা আজ অবধি আমাদের কাছে সায়েন্স ফিকশন হয়েই থেকে গেছে, সেই টেকনোলজি কাজে লাগিয়ে এরা হঠাৎ করে পৃথিবীর দোরগোড়ায় এসে হাজির! এত অল্প সময়ে ওজোন স্তরের ওপর অদৃশ্য জালের মতন ছেয়ে থাকা প্রোটেক্টিং স্যাটেনেট পেরিয়ে এরা যেভাবে চক্ষের নিমেষে হানা দিয়েছে তাতে আরও বোঝা যায় যে এদের টেকনোলজি আমাদের থেকে বহু গুণে উন্নত।

এতদিনে সারা পৃথিবী জুড়েই ওদের কয়েক হাজার ইনটারগ্যালাক্টিক স্পেস শিপ। সারা আকাশ জুড়েই, যেদিকে তাকাও না কেন সেদিকেই। বিষণ্ণ অমোঘ নিয়তির মতো তারা জুড়ে আছে এই গ্রহের সমস্ত আকাশ, সমস্ত ব্রহ্মাণ্ড। যেন অসহায় এই পৃথিবীকে দেখে ঠাট্টা তামাশা করতে এসেছে।

মানে এরা যদি চায় আমাদের নির্মূল করে বসতি গড়তে, আমাদের চান্স খুবই কম। যাক, তাতে আমার আর কী। যত তাড়াতাড়ি মায়ের সঙ্গে দেখা হয় ততই মঙ্গল। আমার এতে

আর কিছু এসে যায় না।

২০ নভেম্বর, ৩০৩৯:

সারা পৃথিবী জুড়ে চাপা দমবন্ধ করা একটা আবহাওয়া।

এদের টেকনোলজি যে আমাদের থেকে বহু গুণে উন্নত, সে আর বলে দিতে হয় না। পৃথিবীর সমস্ত মারণাস্ত্র লঞ্চ করার সিস্টেম এরা মুহূর্তে লক করে দিয়েছে। পৃথিবীর যাবতীয় প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা এখন ঠুঁটো জগন্নাথ।

মুশকিল হচ্ছে এদের কী দাবি, কেন এসেছে, কিছুই বোঝা যাচ্ছে না। সেন্ট্রাল কমান্ডের আধুনিকতম কমিউনিকেশন সিস্টেম অনেক চেষ্টা করেও কোনো যোগাযোগ করতে পারছে না। কোনো উত্তর, কোনো সিগন্যাল, কিছুই নেই। মনে হচ্ছে কয়েক হাজার পাহাড় যেন নির্বাক নিয়তি নির্দিষ্ট অভিশাপের মতোই এই পৃথিবীর আকাশ জুড়ে জমে আছে।

যাক, আমার কী, গোল্লায় যাক এই পৃথিবী, যত তাড়াতাড়ি সম্ভব।

৩০ নভেম্বর, ৩০৩৯:

আজ নাকি তেনাদের কেউ প্রথম বারের জন্য দর্শন দিলেন। সারা পৃথিবীর সমস্ত নিউজ ফিড আজ জেরুজালেমের রাস্তায়। স্বাভাবিক, পৃথিবীর এই এত হাজার বছরের ইতিহাসে প্রথম বার কোনো ভিনগ্রহের জীব এই মাটিতে পা রেখেছে। তাদের দেখতে কেমন এই নিয়ে মানুষের কৌতূহল হওয়াটা স্বাভাবিক। দুনিয়ার বোধহয় আজ এমন মানুষ একটিও নেই যে ওয়ার্ল্ডভিশন খুলে বসেনি।

যদিও শেষে বোঝা গেল সেগুড়ে বালি। স্পেসশিপ থেকে

তারা নেমে এসেছিল অদ্ভুত দর্শন এক যানে। জেরুজালেমের রোবোটিক্স ফিল্ডের মাঠে নেমে তারা ঢুকে পড়ে তাদের জন্যে বিশেষ ভাবে নির্মিত কালো কাচ ঢাকা হোভারকারে। তারপর সেই হোভারকার সোজা ঢুকে যায় কোর কমান্ড অফিসে। পুরো ব্যাপারটা এত গোপনীয় রাখা হয় যে কেউই তাদের টিকিটিরও দেখা পায়নি।

এদিকে আলোচনা কী হল, কী এদের চাহিদা, কী পেলে এরা বিদায় হবে, বা আদৌ বিদায় হবে কি না এই নিয়ে স্বাভাবিক ভাবেই সবাই খুবই উত্তেজিত। লোকপগুলোকেও দেখছি নিজেদের মধ্যে আলোচনা করতে। সমস্ত এডুসেন্টার, স্টাডিভার্সিটি, হেলথপয়েন্ট, ওয়ার্কক্লাউড সব বন্ধ। সারা পৃথিবী জুড়ে একটা ফিসফিসে ভয়ের আবহ ছড়িয়ে আছে যেন। হাজার হাজার গুজবে মাইন্ডবুক ছেয়ে যাচ্ছে, প্রত্যেকটার বিবরণ আগেরটার চাইতে অনেক ভয়াবহ।

আজ রাতে স্বয়ং গোয়েলস্ফাইন ওয়ার্ল্ডভিশনে ভাষণ দেবেন। ওই শুরু হল বোধহয়। দেখি কী বলে।

২ ডিসেম্বর, ৩০৩৯:

কিংকর্তব্যবিমূঢ় বলে একটা শক্ত শব্দ শিখিয়েছিল মা, ছোটোবেলায়। সারা পৃথিবীর এখন সেই দশা। এরপর কী করা হবে কেউই কিছু বলতে পারছে না।

সেদিন ভিনদেশিদের সঙ্গে কোনো কথাই হয়নি সেন্ট্রাল কমান্ডের। না, অন্য কোনো কারণ নয়, ভাষার অভাব। মানে পৃথিবীর কোনো মাইন্ড রিডার, লিঙ্গুইস্টিকা কোনো কিছু দিয়েই তাদের সঙ্গে কমিউনিকেট করা যাচ্ছে না। ফলে বিফল মনোরথ হয়ে তারা কাল চলে গেছে এবং তার আগে শরীরী ভাষায় যেটা প্রকাশ করে গেছে, তার মানে আর যাইহোক

বন্ধুভাবাপন্ন তাকে কিছুতেই বলা চলে না।

অজান্তেই আমার মুখে হাসি চলে এল। আমার মাকে ওরা টেনে নিয়ে গেছিল না দীর্ঘজীবন লাভের জন্য? আরও কত লোকের মা, বাবা, সন্তান, আত্মীয়পরিজন, ভালোবাসার লোককে এই সেন্ট্রাল কমান্ড মেরে ফেলেনি যাতে করে সমাজের কিছু মুষ্টিমেয় ক্ষমতাশালী লোক যেন অনেক অনেক বছর বাঁচে? কোথায় গেল এতশত ষড়যন্ত্র, এত নিবিড় নিষ্পেষণ, অসহায় লোকের এত কান্না? আজ তোমাদের নিশ্চিত মৃত্যুর হাত থেকে কে বাঁচাবে সেন্ট্রাল কমান্ড? কোন্ লাইফশট?

হাহা করে সেই অন্ধকার ঘরে বসে আমি হাসতেই লাগলাম, হাসতেই লাগলাম।

২৫ ডিসেম্বর, ৩০৩৯:

দুপুরবেলা যখন কান্ট্রি কমান্ডের লাইটজেট থেকে জেরুজালেমে নামলাম তখন বেশ লালচে মিঠে ঠান্ডা চারিদিকে। নেমেই দেখি একটা দামি হোভারকার দাঁড় করানোই আছে, তাতেই চারজন টপঅপসের অফিসার আর আমাকে নিয়ে কোর কমান্ড অফিসের দিকে রওনা আলসেবিদিয়াস, ইস্ট ইন্ডিয়ানাল্যান্ডের লোকপবাহিনীর হেডকপ।

আজ সকালে যখন ভদ্রলোক প্রায় জোর করেই আমার অ্যাপার্টমেন্টে ঢোকেন, চারজন গাঁট্টাগোঁট্টা চেহারার লোকপ নিয়ে তখনও আমার ব্রেকফাস্ট শেষ হয়নি। ঢুকেই ধরেবেঁধে সোজা গাড়িতে চালান করার সময় আমি তো যেমন অবাক তেমন বিরক্ত। আজকেই কারও জীবনদাতা হতে হবে জানি, তা ধরেবেঁধে নিয়ে যাওয়ার কী আছে? আরও আশ্চর্যের কথা যে তোরা দু-দিন পর বাঁচবি কি বাঁচবি না তার ঠিক নেই, এখন আবার কার লাইফশট নেওয়ার বাই উঠল?

একবারই শুধু জিজ্ঞেস করেছিলাম যে যাচ্ছি কোথায়। উত্তর এসেছিল, "জেরুজালেম", এবং তাতে বেশ অবাকই হয়েছিলাম।

কোর কমান্ড বিল্ডিংটা দেখতে গোল গম্বুজের মতন, আর বেশ ঠান্ডা। ভেতর দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে ভাবছিলাম এখানেই কি অপারেশন? সেন্ট্রাল কমান্ডের সবারই তো লাইফশট সেই কবেই নেওয়া। তবে?

ভুলটা যখন ভাঙল, তখন অনেক দেরি হয়ে গেছে। তখন আমি অবাক হওয়ার শক্তিও হারিয়ে ফেলেছি।

বিল্ডিংয়ের একদম টপ ফ্লোরে যে বিশাল ঘরটায় আমাকে এনে হাজির করা হল, একঝলক দেখলেই বোঝা যায় যে এটাই সর্বোচ্চ কমান্ডান্টদের মিটিং রুম। রুমের চারিদিকে থ্রিডি ভিশনস্পেস, যে-কোনো ঘটনার, যা চারিদিকে ঘটছে, তার ক্ষুদ্র ত্রিমাত্রিক প্রতিচ্ছায়া ফুটে ওঠে। দেয়ালে বিশাল স্ট্রিংস্ক্রিন, পৃথিবীর বাইরের যাবতীয় খবর ধরার জন্যে। এখন অবশ্য সেই স্ক্রিন জুড়ে শুধু...

ঘরের মধ্যিখানে ভাসমান টেবল। তার চারিধার ঘিরে পৃথিবীর দণ্ডমুণ্ডের কর্তারা, সবারই মুখে উদ্‌বেগ আর উৎকণ্ঠার ছাপ স্পষ্ট।

টেবিলের একদম মাথায় যে লোকটাকে দেখছি, তাঁকে আমি অনেকবার ওয়ার্ল্ডভিশনে দেখেছি।

কমান্ডান্ট-ইন-চিফ গোয়েলস্ফাইন।

আমি সত্যি বুঝে উঠতে পারলাম না, আমাকে কেন এখানে আনা হয়েছে।

শুরুটা গোয়েলস্ফাইনই করলেন, ওঁর সেই বিখ্যাত ওজস্বী কিন্তু সামান্য সানুনাসিক স্বরে,

"মাই বিলাভেড সিটিজেন, আমাদের মধ্যে আজ আপনাকে স্বাগত।"

আমি হতচকিত অবস্থায় শুনতে লাগলাম, "আপনি নিশ্চয়ই অবগত আছেন বর্তমান পরিস্থিতি সম্পর্কে? কী বিপুল বিপদের মধ্যে আমরা সবাই এই মুহূর্তে বাস করছি?" মাথা নাড়তে নাড়তে প্রথম বার খেয়াল করলাম যে ভদ্রলোকের ভাষার উপর দখল অসামান্য।

"আপনি নিশ্চয়ই এও অবগত আছেন যে কয়েকদিন আগে আমাদের মধ্যে আর ভিনগ্রহীদের মধ্যে যে আলোচনার সূত্রপাত হয় তা শুরুতেই ভেঙে যায়?"

মাথা নাড়লাম। জানি তো বটেই।

"আপনি কি জানেন তার কারণ কী?"

"দুই পক্ষেরই বোধ্য এমন ভাষার অভাব", বলে নিজেই চমকে গেলাম। এমন শুদ্ধ ভাষায় শেষ কবে কথা বলেছি আমি? এটা আমারই হ্যান্ডট্যাব তো?

"চমৎকার। এবার বলুন তো, মাননীয় নগরসভ্য, আপনার কাছে যদি আপনার এই মাতৃভূমি, এই পৃথিবী কিছু সাহায্য চায়, আপনি কি সেই সুযোগ প্রত্যাখ্যান করবেন? আপনি কি চান না মানবসভ্যতার উদ্ধারকারী হিসেবে পৃথিবীর ইতিহাসে চিরস্মরণীয় হয়ে থাকতে?"

আর-একটু হলেই হাততালি দিয়ে ফেলছিলাম। অসামান্য বাকপটু এই ভদ্রলোক। তবে বক্তৃতা যতই ভালো দাও, তোমাদের বিন্দুমাত্র সাহায্য করতে আমার বয়ে গেছে। তবুও নিছক কৌতূহলে জিজ্ঞেস করি, মানে হ্যান্ডট্যাবে ফুটে ওঠে "কী ধরনের সাহায্য, মাননীয় কমান্ডান্ট-ইন-চিফ?"

ভদ্রলোক থামলেন। তারপর হাতের ইশারায় বাকি কমান্ডান্টদের যেতে বললেন। খানিকক্ষণ বাদে ঘর খালি হলে খর্বকায় কৃশ ভদ্রলোকটি আমার কাছে এগিয়ে এলেন। তারপর ফিসফিস করে বললেন, "মাননীয় নগরসভ্য, এই ভিনজাতীয় হানাদারেরা একটা ভাষাই বোঝে, যেটা একমাত্র

আপনি ছাড়া এই পৃথিবীর দুশো কোটি জনগণের মধ্যে আর কেউ জানে না।"

উত্তরোত্তর আশ্চর্য হচ্ছিলাম আমি, "মাননীয় চিফ, আমার জ্ঞানত এমন কোনো ভাষা আমি জানি না, যা আর কেউ..."

"সাইন ল্যাঙ্গুয়েজ", প্রায় চাপা ভূতুড়ে গলায় বললেন কমান্ডান্ট-ইন-চিফ, "দে অনলি স্পিক অ্যান্ড আন্ডারস্ট্যান্ড সাইন ল্যাঙ্গুয়েজ, যেটা এই মুহূর্তে আপনি ছাড়া আর কেউ জানে না আমাদের মধ্যে, মাননীয় নগরসভ্য।"

মুহূর্তের মধ্যে মাথাটা ঘুরে গেল। তাই এত তোড়জোড়, আমাকে এখানে নিয়ে আসা। সেদিন থেকেই এরা জানত, আর খোঁজাখুঁজি চলছিল। আলসেবিদিয়াস দেখেছিলেন আমাকে আর মাকে...

চোখ দুটো জ্বালা করে উঠল মায়ের কথা মনে পড়তেই। নাহ, এদের সাহায্য করার বিন্দুমাত্র ইচ্ছে আমার নেই।

"মাননীয় চিফ। আশা করি অবগত আছেন যে এই পৃথিবীতে আমার নিজের বলতে একজনই ছিলেন, আমার মা। শুধুমাত্র বোবা বলে..."

গোয়েলস্ফাইন দ্রুত এসে আমার হাত ধরলেন, "জানি নগরসভ্য। এ ব্যাপারে আমি সম্পূর্ণ

অবহিত। কিন্তু আমাদের, কয়েকজন মুষ্টিমেয় লোকেদের পাপের জন্য সমগ্র মানবসভ্যতাকে কি আপনি ধ্বংসের মুখে ফেলে দিতে চান? চারিদিকে তাকিয়ে দেখুন নগরসভ্য, এরা কি আপনার কেউ নয়?"

গোয়েলস্ফাইনের হাতের ইশারায় মুহূর্তে জ্বলে উঠল চারিদিকের সমস্ত থ্রিডি ভিশনস্পেস। সেখানে দেখলাম অগুনতি মানুষের মুখ, আফ্রিকানাস, ইউরোমেরিকান, রুশেশিয়ান। বৃদ্ধ অধ্যাপক, তরুণ চাকুরে, সাবনর্মাল প্রৌঢ় বাপ, প্রিভিলেজড আদুরে মেয়ে, দোকানদার থেকে শিক্ষক, লোকপ থেকে দরিদ্র

হোভারকার চালক সবাই যেন আমার দিকে তাকিয়ে আছে। চুপ হয়ে, নিঃস্তব্ধ হয়ে, আমারই মতন বোবা হয়ে। যেন লক্ষ লক্ষ চোখ বলতে চাইছে...

মিটিংরুমের কাচের দেয়াল ভেদ করে বিকেলের শেষ রোদ এসে যেন লুটিয়ে পড়ল আমার পায়ে। প্রায় শেষ হয়ে আসা দিনের আলোয় যেন এক অলৌকিক মন্ত্রের মতন গোয়েলস্ফাইনের কথা আমার হ্যান্ডট্যাবে ফুটে উঠল, "ইসরপুত্ত, আজ এদের দিকে তাকাও, এই লক্ষ মানুষের দিকে তাকাও। দেবে না, দেবে না তুমি এদের জীবন ফিরিয়ে? প্রতিশোধ কি তোমার বিবেক অন্ধ করে ফেলবে ইসরপুত্ত..."

আমি আর কিছু বুঝতে পারছিলাম না। আমি, মরিয়মের সন্তান ইসরপুত্ত, মায়ের আদরের জিশু, কী করব? কী করব আমি? প্রতিশোধের যে আগুন বুকে দাউদাউ করে জ্বলছে তাতে এদের ছারখার হতে দেব? নষ্ট হয়ে যেতে দেব এই গ্রহকে? নাকি এই ইসরপুত্ত জিশু হয়ে উঠবে দুশো কোটি লোকের শেষ ভরসা, একমাত্র আশ্রয়, মহত্তম মানুষ?

শেষ জীবনদাতা!


নিষাদ

রাত্রির ঘন অন্ধকারের মধ্যে একটি বটগাছের গোড়ায় দাঁড়িয়ে বড়ো বড়ো করে শ্বাস নিচ্ছিল ছেলেটি। তুমুল বরষায় চারিদিক থইথই, মধ্য শরতে এমন ঘনঘোর বরিষণ ধারা শেষ কবে নেমেছে এই বরেন্দ্রভূমিতে, সে কথা প্রবীণতম কৈবর্ত জালুকী বুড়োও বলতে পারেনি কাল। এই নিবিড় জঙ্গলের মধ্যে মাটি, কাদা, ছোটো জলের ধারা, উপচে পড়া ছোটো ডোবা, গাছের ভাঙা পাতা আর ডাল, ইতস্তত বিক্ষিপ্ত মৃত পশুদের গলিত শব, সব মিলিয়ে স্থানটি নরকতুল্য হয়ে উঠেছে। এক হাত দূরের জিনিস দেখা যায় না ঠিক করে, এমন আকাশভাঙা বিপর্যয় নেমে এসেছে আজ এই চরাচরে।

ছেলেটির অবশ্য তাতে ভ্রূক্ষেপ ছিল না বিন্দুমাত্র। তার পোশাক বলতে কোমরে জড়ানো সামান্য এক টুকরো কাপড়। পাহাড়ের মতন তার বিশাল দেহ, প্রশস্ত বক্ষ, শালপ্রাংশু দুই বাহু আর রাজবাড়ির স্তম্ভের মতন পুষ্ট ঊরুদ্বয়। সম্পূর্ণ কেশবিহীন মস্তক তার, প্রথম দর্শনে মনে হয় কোনো কুশলী স্থপতির বানানো প্রস্তরমূর্তি। কয়েকদিন আগে যখন সে আর তার ঘোর কৃষ্ণ খর্ব নাসা সঙ্গীরা অরণ্য থেকে নেমে এসেছিল এই এলাকায়, নেমে এসেছিল দিব্বোক আর রুদকের রাজধানী ডমরনগরের রাজপথে, সমস্ত নগরী সেদিন আতঙ্কে বিস্ময়ে স্তব্ধ হয়ে গেছিল। বাব্বা, সমগ্র বরেন্দ্রভূমির সবচেয়ে শক্তিশালী মানুষটিও যে আকারে-প্রকারে এদের কাছে শিশু।

কারা এরা? এখানে কী করছে? এরা কি পাল সম্রাট রামপালের পাঠানো বিশেষ বাহিনী? এই ঘোর বিপদের লগ্নে কৈবর্ত সৈন্যদল কোথায়? কৌতূহলের আন্দোলন আছড়ে পড়েছিল রাজার আঙিনায়।

রাজা বলতে আর দিব্বোক নয়, এখন ডমরনগরের নায়ক পুণ্যশ্লোক দিব্বোকের ভ্রাতুষ্পুত্র, বরেন্দ্রসূর্য ভীম।

মহাকায় ভীম যখন সিংহাসন থেকে নেমে এসে এই

ছেলেটিকে জড়িয়ে ধরলেন, মস্তক আঘ্রাণ করে দিলেন সহস্র আশিসচুম্বন, কালিন্দী নদীর প্রতিটি তরঙ্গ আর বারেন্দ্রীর গেরুয়া মৃত্তিকার প্রতিটি কণা যেন বিস্ময়ে প্রস্তরীভূত গেল। সেই বিস্ময় অবশ্য সহর্ষ উল্লাস আর আশ্চর্যচকিত আনন্দে বদলে যেতে দেরি হয়নি, যখন রাজা ভীম জনসাধারণ্যে ঘোষণা করলেন এই নিষাদপুত্র তাঁর আত্মজ, কুমার শর্ব্বের মতো এর শরীরেও বইছে তাঁর রক্তের উত্তরাধিকার!

দাবানলের মতো রাজ্যের একপ্রান্ত থেকে আর-এক প্রান্ত অবধি ধেয়ে গেল সেই সংবাদ। কৌতূহলে ফেটে পড়ল সমগ্র বরেন্দ্রভূমি। মহারাজ ভীমের এক নিষাদপুত্র যে আছে, এই সংবাদটাই রাজ্যবাসীর কাছে অপ্রত্যাশিত ছিল। কই, আগে তো ঘুণাক্ষরেও রাজা কিছু বলেননি!

কানাকানি হতে হতে অবশ্য জানা গেল সবই।

বছর দশেক আগের কথা, সম্রাট মহীপাল তখন মহাপরাক্রমে গৌড়ের শাসনক্ষমতায় অধিষ্ঠিত। অশেষ ক্রূরকর্মা এই সম্রাট মহীপাল, যেমন নিষ্ঠুর, তেমনই অবিবেচক। নিতান্ত অলীক সন্দেহের বশে নিজের ভাই শূরপাল আর রামপালকে কারাদণ্ড দিতে সাম্রাজ্যের দিকে দিকে জ্বলে উঠল রোষবহ্নি, মহাপরাক্রান্ত সামন্তরা বিরূপভাব ধারণ করতে লাগলেন। মহাসান্ধিবিগ্রহিক পদ্মনাভ আর প্রধান অমাত্য বরাহস্বামী দুজনেই প্রখরবুদ্ধি কুশলী কূটনীতিক, কিন্তু এই অসন্তোষ সামলাতে তাঁদেরও যথেষ্ট বেগ পেতে হল।

কিন্তু না, মহাসামন্তরা নয়, পাল সাম্রাজ্যের মহাসর্বনাশ ধেয়ে এল সম্পূর্ণ অন্যদিক থেকে। দুই মহাবুদ্ধি অমাত্য ভুলে গেলেন পাল সাম্রাজ্যের মধ্যে ধিকিধিকি করে জ্বলতে থাকা আর-একটি জ্বালামুখীর কথা, আর-এক জনজাতির মধ্যে

ধূমায়িত ক্ষোভের কথা।

ভুলে গেলেন এই বারেন্দ্রীর কৈবর্তদের কথা।

ফসল আর জমির অধিকার নিয়ে পাল সাম্রাজ্যের সঙ্গে, মাছ ধরা নিয়ে রাজানুকম্পাপুষ্ট বৌদ্ধদের সঙ্গে বরেন্দ্রভূমির কৈবর্তদের বিরোধ বহুদিনের। সম্রাট মহীপালের অবিবেকী অত্যাচার, নিপীড়ন আর জাতিঘৃণা আহুতি হিসেবে পেয়ে কৈবর্তদের সেই বহুদিনের জমানো ক্ষোভাগ্নি হয়ে উঠল বিদ্রোহের দাউদাউ লেলিহান শিখা, গ্রাস করতে চাইল সমগ্র কৈবর্তভূমিকে।

সেই সময়ে বরেন্দ্রীর অহংকার দিব্বোকের ভাই রুদক এবং রুদকপুত্র ভীম অজ্ঞাতবাসে ঘুরছিলেন বিভিন্ন সামন্তপ্রদেশে। তাঁরা জানতেন পাল সাম্রাজ্যের ভিত্তি এই অনন্তসামন্তচক্র। যদি এই সামন্তদের মধ্যে ভাঙন ধরানো যায়, যদি একটি অংশ যদি কৈবর্ত সাহায্যে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হয়, তবে সেই খণ্ডসামন্তচক্র চালিত পালসৈন্যদের পরাস্ত করা এমন কিছু কঠিন কাজ নয়। নৌসংগ্রামে কৈবর্তরা এমনিতেও অজেয়, তারা জন্মজালিক, তাদের জন্মনাড়িতে মিশে থাকে জলের আঁশটে গন্ধ। তাদের ভয় ছিল শুধু দুটি ক্ষেত্রে। প্রথমত অশ্বারোহী সৈন্যবল বলে তাদের কিছু নেই। আর দ্বিতীয়ত, জঙ্গল যুদ্ধে পালসৈন্য আর কৈবর্তসেনা তুল্যমূল্য। এইখানে তাদের দরকার ছিল জঙ্গলকে নিজের মতো চেনে এমন সহযোগী যোদ্ধৃবর্গ। তাদের হাতের কাছে ছিলও এমন এক জনজাতি যারা জঙ্গল যুদ্ধে প্রায় অজেয়, কিন্তু তারা মোটেও সম্মত হয়নি কৈবর্তদের সাহায্য করতে।

কোচ। তারা সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ অবস্থান নেয়। রাষ্ট্রবিপ্লব সবসময়ে সবার সহ্য হয় না।

এমনই এক অগ্নিগর্ভ সময় আসতে পারে তা আঁচ করতে পেরেই দিব্বোকের আদেশানুসারে রুদক আর ভীম ঘুরছিলেন পাল সাম্রাজ্যের বিভিন্ন সামন্ত রাজ্যে। এমনই এক সময় তৎকালীন মগধাধিপ সামন্ত রাজাটির সঙ্গে দেখা করে গৌড়ে ফেরার সময় তাঁরা পথ হারান মগধের নিম্নভাগের এক পাহাড়িয়া জঙ্গলের মধ্যে।

সেইদিন মনে পড়লে আজকের অকুতোভয়, সমরনিপুণ, নির্ভীকশ্রেষ্ঠ কৈবর্তরাজ ভীমের কপালে আজও স্বেদবারি লক্ষ করা যায়। সেই ঘন শ্বাপদসংকুল অরণ্যে নেহাত দৈবানুগ্রহে আর স্বীয় বলপ্রভাবে যাবতীয় প্রতিকূল পরিস্থিতি পরাস্ত করে বেঁচেছিলেন তাঁরা। দৈবাৎ এমন গহীন, মনুষ্য সংস্পর্শহীন অরণ্যে তাঁরা প্রবেশ করেন, যা তাঁদের সম্পূর্ণ অপরিচিত। তাঁদের মনে হয়েছিল হয়তো বা এই অতি আদিম, অতি ভয়াল সেই অরণ্যে আজ অবধি কোনো মানুষের পা পড়েনি অদ্যাবধি। কিন্তু সেই ভুল অচিরেই ভেঙে যায়, যখন একদল আদিম, উলঙ্গ, হিংস্র নিষাদ অকস্মাৎ তাঁদের ঘিরে দাঁড়ায়। চলাফেরা তাদের ধূর্ত শৃগালের মতোই নিঃশব্দ, চোখে তাদের বিষধর ভুজঙ্গবৎ শীতল নিষ্ঠুরতা, শরীরের প্রতিটি পেশিতে মত্ত মাতঙ্গসম শক্তির আভাস। এবং তাদের ক্ষুধার্ত লোলুপ দৃষ্টি যে নিঃসংশয় ইঙ্গিত বয়ে আনে, তার একটিই মানে দাঁড়ায়।

এরা নরমাংসভোজী!

সেইদিনই যে দুজনে নিহত হতেন সে নিয়ে বিন্দুমাত্র সংশয় নেই।, যদিও দুজনেই লড়াই করেছিলেন যথার্থ স্বাধীনচেতা কৈবর্তদের মতোই। বিশেষত যৌবনমদমত্ত ভীমের ওপর যেন ভর করেছিলেন ক্ষত্রিয়হন্তা পরশুরাম স্বয়ং। কিন্তু সংখ্যাধিক্যে প্রবল সেই নিষাদবাহিনীর লোলুপ শ্বাস ক্রমশই তাঁদের মৃত্যুর সুনিপুণ জালে জড়িয়ে ফেলেছিল

খুব দ্রুত। আসন্ন মৃত্যুর সামনে দুজনেই প্রায় সংজ্ঞাহীন হয়ে পড়েছেন, এমন সময় একটা দীর্ঘ শিসের শব্দ শুনে হঠাৎ করেই সেই অসভ্য নরখাদক নিষাদের দল তাঁদের ছেড়ে দূরে সরে যায়, তাদের চোখে তখন সম্ভ্রমের দৃষ্টি।

আর তাদের মধ্যে সর্বংসহা নিয়তির মতন সেখানে এসে দাঁড়ান এক নারী। সম্পূর্ণ উলঙ্গ সেই

পূর্ণ যৌবনবতী আদিম রমণীটি যেন তাঁর সমগ্র দেহে জড়িয়ে এনেছেন মহাকালের গহ্বর থেকে বুনে আনা রাত্রির অনন্ত কৃষ্ণ আঁচল। শান্ত দু-চোখ দুটিতে শূন্যতার অসীম হাহাকার জড়িয়ে তিনি এসে দাঁড়ান সেই রণভূমির মধ্যে। তিনিই ইশারা করেন এই দুই অনুপ্রবেশকারীকে বেঁধে নিয়ে যেতে।

পরের ঘটনা অতি সংক্ষিপ্ত। আদিম মাতৃতান্ত্রিক নিষাদগোষ্ঠীর প্রধানা সেই নারী তাঁদের মুক্তি দিতে রাজি হন বটে, কিন্তু একটি অতি সাধারণ দাবির বিনিময়ে। রুদ্দকপুত্র ভীমের কৌমার্য হরণ করবেন সেই উদ্ভিন্নযৌবনা নিষাদ রমণী। করবেন এক পক্ষকাল ধরে। প্রতিদিন। প্রতিনিশি।

রাজি হতে দুবার ভাবেননি রুদ্দক। এই উগ্র নরখাদক নিষাদজাতির নৈশভোজ হওয়ার থেকে এদের একপক্ষকাল যাবৎ শ্বশুর হওয়াটাই বরং তাঁর কাছে অনেক বেশি গ্রহণীয় মনে হয়েছিল।

তারপর অনেক নারীসঙ্গ করেছেন ভীম। প্রাগজ্যোতিষ থেকে কলিঙ্গ, প্রয়াগ থেকে সমতট, বহুবিচিত্র নারীর কামার্ত বাঁধনে ধরা দিয়েছেন বীরশ্রেষ্ঠ ভীম। কিন্তু এখনও একান্ত অবসরে চোখ বুজলেই সেই ঘোরকৃষ্ণা নিষাদ রমণীর আদিম আরণ্যক স্বাধীন কামগন্ধ তাঁর রন্ধ্রে রন্ধ্রে বর্ষার কালিন্দীর মাতম জাগিয়ে তোলে। সেই সুবর্তুল স্তনদ্বয়, সেই ভারী নিতম্ব দুটি, সেই রহস্যঘন উরুসন্ধি, সেই শীৎকার, সেই নখরাঘাত,

সেই আশ্লেষ, সেই সুদীর্ঘ নেশাতুর রমণক্লান্ত দিন কয়টি। এক অমাবস্যা তিথিতে রক্তচর্চিত প্রস্তর খণ্ডের সামনে গলায় বন্যপুষ্পের মালা ঝুলিয়ে, সমবেত নৃত্যগীতবাদ্যর মধ্যে মহুয়ার রসস্নাত মাদকাচ্ছন্ন রাত্রি দিয়ে সেই সুদীর্ঘ কামপক্ষের শুরু। চাঁদের কলাবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে প্রকাশ পেয়েছে সেই বন্য দুহিতার অসংকোচ রমণতৃষ্ণা। সেই অখণ্ড নিবিড়তার মধ্যে কোথা থেকে যে এক চান্দ্রপক্ষ কেটে গেছে তা টেরই পাননি তিনি।

এই নিষাদপুত্র সেই স্বাধীনা নিষাদকন্যার সন্তান। না, এ ছেলে ভীমের ঔরসজাত নয়। কার ঔরসজাত সে কথা সেই মাতৃতান্ত্রিক গোষ্ঠীর প্রধানা রমণীটি নিজেও জানেন না। শুধুমাত্র ভীমের পৌরুষতৃপ্ত সেই রমণী একদিন তাঁদের অরণ্যের প্রান্তবর্তী একটি প্রস্তরমূর্তির সামনে, গোপন নিষাদতন্ত্র অনুযায়ী এই নিষাদপুত্রকে ভীমের সন্তান হিসেবে নিযুক্ত করেন। সেই থেকে এই নিষাদপুত্র নিজেকে কৈবর্তসন্তান ভীমের পুত্র বলেই পরিচয় দেয়।

একমাত্র মা-ই জানেন তাঁর গর্ভস্থ সন্তানের পিতা কে!

সেই নিষাদপুত্র আজ তাদের জঙ্গলের ঘেরাটোপ ছেড়ে পিতৃস্বার্থে নেমে এসেছে বরেন্দ্রভূমিতে, এসেছ নিষাদজননীর আজ্ঞা শুনে। লোকমুখে সেই নিষাদরাজ্ঞী শুনেছেন এই বিপুল রক্তক্ষয়ী সংগ্রামের কথা, শুনেছেন স্বাধীনতার দাবিতে, ন্যায়ের দাবিতে কৈবর্তদের সর্বস্ব পণ রেখে এই প্রাণান্তক লড়াইয়ের খবর। তাই তিনি তাঁর গর্ভজাত বীরপুত্তলিটিকে পাঠিয়েছেন তাঁর ধর্মপিতার কাছে। তিনি আশা করেন প্রবল বিক্রম পিতা তাঁর প্রশস্ত বক্ষে বীর পুত্রকে ঠাঁই দেবেন অবশ্যই। এবং সেই পিতা তাঁর যোগ্য পুত্রকে শিখিয়ে দেবেন আধুনিকতম সমরকৌশল, পাঠ দেবেন সমকালীন রাজনীতির কূটাভাস।

আর যদি তাঁর পুত্র পরাস্ত হয় দৈবগতিকে? পরাস্ত হন

তার পরাক্রান্ত পিতা?

ধুর, তাও সম্ভব নাকি? স্থানীয় ধর্মগুরুরা কি বিন্ধ্যাদেবীর আশির্বাদী ফুল এনে দেননি ওর কেশবিহীন মস্তকে? অপদেবীর বিষাক্ত দৃষ্টিক্ষেপ থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্যে উৎসর্গ করা হয়নি কি বিজিত জাতির সমর্থ নারীদের মুণ্ড? তবে?

সেই আশাতেই এই মহারণে নিজের বীর সন্তানকে পাঠিয়েছেন সেই নিষাদনেত্রী।

সে একা আসেনি, এসেছে একশোজন বাছা বাছা নিষাদযোদ্ধা নিয়ে। তাদের এক-একজনের বিশাল শরীরে সহস্র হস্তীর বল, চোখে আদিম অরণ্যের শীতল নিষ্ঠুরতা। তারা কৈবর্তবাহিনীকে সেই তীক্ষ্ণতা দিয়েছে যার অভাবে এতদিন তারা বার বার পরাস্ত হচ্ছিল পাল সৈন্যবাহিনীর হাতে। সেই তীক্ষ্ণতার একটিই নাম, আরণ্যযুদ্ধনৈপুণ্য!

সেই প্রবল বর্ষাধারার মধ্যে অকম্পিত দীপশিখার মতো স্থির দাঁড়িয়ে ছিল ছেলেটি। তার প্রশস্ত নগ্ন বক্ষ জুড়ে নেমে যাচ্ছিল সেই অকাল বর্ষণের ধারাপ্রপাত। তার সমস্ত ইন্দ্রিয় ছিল ধনুকের সটান ছিলার মতোই তীক্ষ্ণ ও তীব্র। এই ধারাপ্রপাতের ঘোরশব্দের মধ্যেও তার কানে ধরা পড়ছিল টুকরো টুকরো ক্ষীণ শব্দগুলি। সব ঠিক আছে। ওরা এসে পড়েছে কাছাকাছিই, ওর সঙ্গীসাথিরা।

নিজের মাথায় হাত বুলিয়ে নিজেই একবার হেসে নিল সে, এমন ন্যাড়া মাথার জন্যেই তো মা ভালোবেসে ওকে ডাকে...

কী যেন ডাকে? মনে পড়ে না ছেলেটার। এই একটা ওর অসুবিধা, সবসময় সব কথা ওর মনে থাকে না। মাঝেমধ্যেই বেভুল হয়ে যায় ওর সবকিছু, ফ্যাল ফ্যাল করে চেয়ে থাকে চারিদিকে। এমন সময় মা এসে ওর ন্যাড়া মাথায় হাত বুলিয়ে দিয়ে মিঠে গলায় ডাকে...

আহ, কী বলে যেন ডাকে?

মাথাটা একবার ঝাঁকিয়ে নেয় ও। কিছুতেই মনে পড়ছে না। অথচ বাকি সব স্পষ্ট মনে আছে। এই যেমন এরা এই জঙ্গলে এখন কী করছে!

জঙ্গলের সীমানা শেষ হতেই কালিন্দী নদী, গৌড়বঙ্গে প্রবেশ করে যার নাম হয়ে যায় রায়মঙ্গল। সেই নদী আর জঙ্গলের মধ্যে শিবির ফেলেছেন কোটাটবীনাথ বীরগুণ এবং তৈলকম্পাধিপতি রুদ্রশিখর। মগধনরেশ ভীমযশের পর পাল সাম্রাজ্যের পক্ষাবলম্বী হয়ে সর্বাধিক সৈন্যসংস্থাপন করেছেন এই দুই সামন্তপ্রভু। এদের ওপর একটি ভয়াবহ আঘাত হানতে পারলেই পাল সৈন্যদের অনেকটা দুর্বল করা যাবে। একই সঙ্গে কৈবর্ত নৌসেনার জন্য উন্মুক্ত হবে কালিন্দী। সেই উদ্দেশ্যেই বাবা নামের লোকটা... না না না, বাবা নয়, মহারাজ ভীম আজ তাঁদের এই নিশাভিযানে পাঠিয়েছেন।

জঙ্গলের মধ্যে অবশ্য প্রহরার কমতি ছিল না। কমপক্ষে চল্লিশটি মৃতদেহ এখনও সেই গহীন অরণ্যের মধ্যে কোথাও পড়ে আছে। ভাবতেই লোলুপ একটা চিন্তা মুহূর্তের জন্যে আচ্ছন্ন করে ফেলে তাকে।

নাহ কাজ আগে। একটা হালকা শিসের শব্দ করে জঙ্গলের শেষ প্রান্তে এসে দাঁড়ায় সে, পিছনে পিছনে ঘাতকমূর্তি ধরে আরও একশোজন নিষাদ।

শিবিরের মধ্যে অস্থির ভাবে পায়চারি করছিলেন সম্রাট রামপাল। সামনে গম্ভীরভাবে বসেছিলেন প্রধান অমাত্য মথনদেব, প্রধান সেনাপতি বিশুদ্ধানন্দ, রামপালপুত্র বিত্তপাল এবং মহাসান্ধিবিগ্রহিক সত্যব্রত।

"দুটি শিবির সম্পূর্ণ বিধ্বস্ত?" উদগ্র বিস্ময়ে প্রশ্ন করলেন সম্রাট।

"হ্যাঁ প্রভু, কমপক্ষে অর্ধসহস্র সামন্তসৈন্য নিহত।

দ্বিশতাধিক সৈন্য সেই ঘোর আক্রমণের সামনে দিশেহারা হয়ে উত্তাল কালিন্দীতে ঝাঁপ দেয়, তাদের কারওই কোনো খোঁজ নেই", ধীর ও শুষ্ক স্বরে জানালেন সত্যব্রত।

"আশ্চর্য। অতি আশ্চর্য। কারা করল এসব? রুদ্রশিখর, বীরগুণ, দুজনেই আমাদের মহাশক্তিশালী সামন্তসহায়। যদি তাদেরই অমন বলশালী সৈন্যদলের এই ভয়াবহ পরিণতি হয়, তাহলে বাকি সামন্তশাসকরা কী ভাববেন? কী করে হল এসব? কারা করল?"

এইবার নড়েচড়ে বসলেন সত্যব্রত। পদাধিকারবলে তিনি গুপ্তচরবাহিনীর প্রধানও বটে। তাঁর কণ্ঠস্বরে সর্বদাই এক আবেগহীন নৈর্ব্যক্তিকতা খেলা করে। সেই নিরাবেগ নিষ্কম্প স্বরে তিনি কথা বলতে শুরু করলেন,

"যে দুজন সৈনিককে আমরা জীবিত উদ্ধার করতে পেরেছি, তারা এক অদ্ভুত কাহিনি বলছে প্রভু। সেই ঘোর বর্ষারজনিতে সৈন্যবাহিনীর প্রত্যেকে আকণ্ঠ পৈষ্টী, গৌড়ীয় প্রভৃতি পান করে অতি সত্বর নিদ্রাভিভূত হয়। রাত্রির দ্বিতীয় প্রহরে অকস্মাৎ এদের ঘুম ভেঙে যায় এবং তখন তারা স্কন্ধাবারের প্রায় নিভন্ত প্রদীপের আলোয় দেখে যে জনা কয়েক উলঙ্গ এবং ভীষণদর্শন পুরুষ কৃপাণ আর প্রস্তরনির্মিত গদাহস্তে ঘোররবে সৈন্যনিধনে রত। যারাই বাধা দিতে গেছে, মুহূর্তমধ্যে নিহত হয়েছে। সেই রক্তস্নাত উলঙ্গ কালভৈরবসদৃশ পুরুষদের সামনে কেউই কোনো প্রতিরোধ করতে পারেনি। যেভাবে শৌখিন গুল্মলতা বন্য কুঠারাঘাতে ছিন্নভিন্ন হয়, নিদ্রিত সামন্তসৈন্যরা সেই রাতে সেইভাবেই নিহত হয়েছে।"

বিস্মিত হলেন রামাবতীনাথ পালসম্রাট রামপাল, "কারা এরা? কোথা থেকে এল?"

"বলা দুষ্কর প্রভু। সামান্য আলো-আঁধারিতে এরা যা দেখেছে, সেই অনুযায়ী সেই ঘাতকদের দেহ অতি বিশালাকার,

অদ্ভুত তাদের হননকৌশল, অসম্ভব দ্রুত তাদের চলন। দেখে মনে হয় নরকের মায়াবী দৈত্যরা যেন জীবন্ত বিভীষিকার রূপ ধরে পাতাল থেকে উঠে এসেছে। তারা মানুষ নয়, কালান্তক যমরাজ যেন স্বয়ং শিকারে বেরিয়েছিলেন তাঁর নারকীযূথ নিয়ে... অন্তত তাদের বিশালদেহী, কেশহীন নেতাকে দেখে তাইই মনে হচ্ছিল। কৃপাণের এক এক আঘাতে সে দুইটি মস্তক দেহ থেকে বিযুক্ত করার ক্ষমতা রাখে, এতই শক্তিধর সে।"

অবাক বিস্ময়ে তাকিয়ে থাকেন সম্রাট এবং বাকি অমাত্যরা, তাঁদের মুখে কথা জোগায় না।

শুধু তাই নয়, সৈনিক দুজন আরও একটি কথা বলেছে, যা এতই অদ্ভুত এবং অবিশ্বাস্য যে..." এতটা বলেই চুপ করে গেলেন সত্যব্রত।

"কী হল, থেমে গেলেন কেন?" সামান্য অস্থিরতাই প্রকাশ পেল সম্রাটের গলায়।

"সম্রাট কি ভুলে যাচ্ছেন যে ওই সৈনিক দুটি তাদেরই স্বীকারোক্তি অনুযায়ী সম্পূর্ণ মদ্যপাবস্থায় ছিল? কী দেখতে কী দেখেছে... তাদের কথায় এতটা গুরুত্ব দেওয়ার কোনো প্রয়োজন নেই বলেই মনে হয়। আমার মতে সবই ওই নীচ কৈবর্তদের নোংরা খেলা... অমন ভীতিপ্রদ বর্ণনা আসলে দেবী আসবেশ্বরীর কৃপায় পরিলক্ষিত কল্পিত কাহিনি মাত্র। কালিঝুলি মেখে কাপুরুষের মতো রাতের অন্ধকারে এসে..." দাঁতে দাঁত ঘষেন প্রধান সেনাপতি বিশুদ্ধানন্দ, সম্পর্কে তিনি সম্রাটের আত্মীয়ও বটে। রাষ্ট্রকূট বংশের মানুষ তিনি, স্বভাবটা স্বতই সামান্য উগ্র।

"পালাবার ঠিক আগের মুহূর্তে সেই স্কন্ধাবারের বাইরে তারা দেখে যে", নির্বিকার স্বরে বলতে থাকেন রাজ্যের সান্ধিবিগ্রহিক সত্যব্রত, "কালিন্দীতীরে সেই অঘোর ভৈরবের

দল..." বলে একবার ঢোঁক গিললেন, "মৃত সৈনিকদের দেহ নিয়ে ভোজনসভা বসিয়েছে!"

"কী বললেন? ভোজসভা? সৈনিকদের মৃতদেহ নিয়ে? এই কথাটার মানেটা কি অমাত্য সত্যব্রত? তারা কি কাঁচা নরমাংস ভক্ষণে ব্যস্ত ছিল?" সম্রাট রামপালের চোখে স্পষ্টতই অবিশ্বাস।

"হ্যাঁ প্রভু, আপনার অনুমান যথার্থ।"

শিউরে উঠলেন সম্রাট, চোখ বন্ধ করে তথাগতকে স্মরণ করলেন। বিত্তপাল এখনও কিশোর, তার মুখ দেখে মনে হল এখানেই বমন করে ফেলবে সে।

"এ কথা যে তাদের স্বকপোলকল্পিত নয় তার প্রমাণ কী?" ভ্রূকুটিকুটিল চোখে প্রশ্ন করলেন সেনাধ্যক্ষ বিশুদ্ধানন্দ।

"কারণ পরদিন প্রভাতে আমরা সেইস্থানে বেশ কয়েকটি অর্ধভুক্ত নরদেহ পেয়েছি", অসম্ভব নৈর্ব্যক্তিকভাবে উত্তর দেন সত্যব্রত।

এরপর আর কারওই কিছু বলার থাকে না।

এর মধ্যেই শিবিরের আলোচনায় মাথা গলায় রাজপ্রতিহারী, সংকুচিত স্বরে জানায়, "আমি ক্ষমাপ্রার্থী মহারাজ, কিন্তু কজঙ্গল মণ্ডলাধীশ নরসিংহার্জুনের প্রধান সেনাধ্যক্ষ ভুজঙ্গদাস মহারাজের দর্শনাকাঙ্ক্ষায় বাইরে উপস্থিত। এই দণ্ডেই তিনি মহারাজকে কিছু সংবাদ দিতে চান।"

ভুজঙ্গদাসের ভগ্নদূতসম রূপ দেখে দুঃসংবাদ বলেই আশঙ্কা করেছিলেন সম্রাট রামপাল। কিন্তু তাই বলে এতটা আশা করেননি!

আজকের দ্বিপ্রহরে, প্রকাশ্য দিবালোকে নরসিংহার্জুনের স্কন্ধাবারে চকিত বন্য আক্রমণে দ্বিশতাধিক সৈন্য নিহত। সমস্ত শিবির ইতোনষ্টস্ততোভ্রষ্ট অবস্থায় বিক্ষিপ্ত ও ধ্বংসপ্রাপ্ত। আক্রমণকারী বিশালদেহী বন্যদের দল লুণ্ঠন করে নিয়ে গেছে

অজস্র অস্ত্রশস্ত্র এবং মূল্যবান মাণিক্যসমূহ। কোনোমতে প্রাণ হাতে করে পালিয়ে বেঁচেছেন সামন্তশ্রেষ্ঠ নরসিংহার্জুন। তাঁর প্রিয়তমা নর্তকী অম্বালিকার শরীর পাওয়া গেছে স্কন্ধাবারের সংলগ্ন জঙ্গলে, অবশ্য শরীর বলা ভুল, অর্ধভুক্ত দেহাংশ বলাই ভালো। বাম স্তনের তিল এবং দক্ষিণ পদাঙ্গুলি পরিহিত অঙ্গুষ্ঠটি দেখে শরীরটি অম্বালিকার বলে চিহ্নিত করেন রাজা নরসিংহার্জুন স্বয়ং!

এক আতঙ্কজনক কালসন্ধ্যা যেন নেমে এল এই উজ্জ্বলিত শিবির মধ্যে। এই মুহূর্তে এই নৃশংস নরখাদকবাহিনীর বিরুদ্ধে কোনো প্রতিরোধী ব্যবস্থা না নেওয়া হলে শুধু কজঙ্গল কেন, বাকি যে যে সামন্তপ্রভুরা পালসম্রাট রামপালের ধ্বজতলে একত্র হয়েছেন বরেন্দ্রভূমি উদ্ধারকল্পে, তাঁদের প্রত্যেকে যে বিরূপ হবেন, সে কথা বুঝতে সভায় উপস্থিত কারওই অসুবিধা হওয়ার কথা নয়, হয়ওনি। মাথা নীচু করে সেই কথাই ভাবছিলেন রামপাল। বাকিরাও মূঢ়, মূক, ম্লান মুখে ভাবছিলেন এই সদ্যজাত ঘটনার গতিপ্রকৃতি।

সহসা গলা খাঁকারি দিয়ে উঠলেন মথনদেব। শুধুমাত্র প্রধান অমাত্যই নয়, সম্পর্কে তিনি সম্রাটের মাতুলও বটে। প্রগাঢ় কূটবুদ্ধিসম্পন্ন এই দক্ষিণী ব্রাহ্মণের ওপর অগাধ আস্থা সম্রাটের। সবাই তাঁর দিকে তাকাতে তিনি শান্ত ও গম্ভীর স্বরে বলতে শুরু করলেন,

"আমার মনে হয় এখানে কিছু কথা বলা প্রয়োজন। একটি প্রাচীন রহস্য বহুদিন ধরে আমাকে বিব্রত করে রেখেছে। জানি না কেন মনে হচ্ছে যে এই আধিভৌতিক ঘটনাবলির সঙ্গে তার যোগ থাকলেও থাকতে পারে।" এই পর্যন্ত বলে একটু থামলেন মথনদেব, চারিদিকে তাকিয়ে দেখলেন একবার। সমগ্র শিবিরে তখন তৃণপতনতুল্য স্তব্ধতা, প্রতিটি লোক উৎকর্ণ হয়ে শুনছেন তাঁর প্রতিটি শব্দ। আবার

শুরু করলেন তিনি,

"আপনারা জানেন যে পূর্বতন মহারাজ যখন সম্পূর্ণ ভ্রান্তিবশে বর্তমান সম্রাটকে বন্দি করেন, তখন থেকে আমি গোপনে বিভিন্ন সামন্তশাসকদের সঙ্গে যোগাযোগ রেখে চলেছিলাম। বলতে বাধা নেই, বিশ্বাসঘাতক কুচক্রী দিব্যোকের সঙ্গেও তখন আমাদের গোপন যোগাযোগ ছিল এবং আমরা নিয়মিত আমাদের মধ্যে খবরের আদানপ্রদান করতাম। কারণ সেই সময়ে আমাদের শত্রু ছিলেন একই, সম্রাট মহীপাল। বস্তুত দিব্যোককে আমিই প্ররোচিত করি গৌড় আক্রমণ করতে, গূঢ়পুরুষদের দ্বারা তার কাছে পৌঁছে দিই পালবাহিনীর গোপন তথ্যসমূহ, চিহ্নিত করে দিই দুর্বল অংশগুলিকে।

যে ঘটনার কথা বলছি, তা আজ থেকে প্রায় দশবছর আগেকার। সেই সময়ে একবার আমারই ব্যবস্থাপনায় দিব্যোকভ্রাতা রুদক এবং তার কুলাঙ্গার সন্তান ভীম, তারা দুজনে মগধ যায় তৎকালীন মগধনরেশ দিব্যরক্ষিতের সঙ্গে দেখা করতে। খবরে প্রকাশ, দিব্যরক্ষিতের সঙ্গে দেখা করার পর থেকে গৌড়ে ফিরে আসতে তাদের যা সময় লাগার কথা, তার থেকে ঠিক একমাস সময় বেশি লাগে।

এই বিলম্বের কারণ আমি বহুবার তাদের কাছ থেকে জানতে চেয়েছি, কিন্তু প্রতিবারই তারা বিভিন্ন কারণ দেখিয়ে এই প্রশ্নের উত্তর দেওয়া এড়িয়ে গেছে। আমিও শেষে বিরক্তিবোধে তাদের এই বিষয়ে প্রশ্ন করা ত্যাগ করি, যদিও সংশয়ে অবশেষে, নিতান্ত দৈবাৎ আমি এই বিলম্বঘটিত কারণের কিছু সূত্র পাই।

সেই ঘটনার বেশ কয়েক বছর পর জগদ্দল মহাবিহারের গোপন প্রকোষ্ঠে, বিহারাধ্যক্ষ ভন্তে স্থবিরপা-র নেতৃত্বে মহীপালবিরোধীদের এক সভা সংঘটিত হয়। সেই সভা ভঙ্গ

হওয়ার পর আমি আর রুদক আকণ্ঠ মাধ্বীক পান করি। সেইদিন নেশার আবেশে সেই নীচ, ধূর্ত, কুটিলচেতা কৈবর্ত আমাকে জানায় সেইবার তাদের বিলম্বের প্রকৃত কারণ।"

ফের একবার থামলেন মথনদেব। বাতাসও বোধকরি উদগ্রীব হয়ে শুনছিল তাঁর কথা। বাকিদের তো কথাই নেই। প্রত্যেকে নিশ্বাস অবধি বন্ধ করে রেখেছেন, সমস্ত ইন্দ্রিয় দিয়ে যেন শোষণ করছেন মথনদেবের কাহিনি।

"পীঠি থেকে গৌড় ফেরার পথে, তারা নাকি নিতান্তই গ্রহবৈগুণ্যে কোনো আদিম নরমাংসাশী অসভ্য জনজাতি কর্তৃক বন্দি হয়। মত্ত রুদকের স্বীকৃতি অনুযায়ী, সদ্যযুবা ভীমকে সেই নরখাদী গোষ্ঠীর নেত্রীর হাতে পক্ষকালযাবৎ তুলে দেওয়ার প্রতিশ্রুতির বিনিময়েই ছাড়া পায় তারা। ব্যাস, এইটুকুর বাইরে বহু প্রশ্ন করেও আর কোনো উত্তর পাইনি আমি।"

"নেত্রীর হাতে তুলে দেওয়া? এর মানে কী? সেই কুলাঙ্গার যে নিহত হয়নি সে তো দেখাই যাচ্ছে। তাহলে তাকে একপক্ষকাল নিজের কাছে রেখে কীই বা করলেন করলেন সেই জংলি গোষ্ঠীনেত্রী?" বিস্মিত হয়ে প্রশ্নটা করেই ফেললেন বিশুদ্ধানন্দ।

আড়চোখে একবার বিত্তপালের দিকে তাকালেন মথনদেব। তারপর সামান্য বিব্রত স্বরে বললেন, "খুব সম্ভবত পক্ষকালব্যাপী অবাধ যৌনতা। মাতৃতান্ত্রিক আদিম শবর ও নিষাদদের মধ্যে এর প্রচলন আছে বইকি!"

কিশোর বিত্তপাল একবার ফিচিক করে হেসে ফেলেই গম্ভীর হয়ে যায়।

সমগ্র সভা স্তব্ধ হয়ে এই কাহিনি শুনছিল। সেই নৈঃশব্দের মাঝেই রাজপ্রতিহারী ফের প্রবেশ করে সভায়। খুবই ইতস্তভাবে জানায় যে গুপ্তপুরুষবাহিনীর প্রধান অনঙ্গদেব

এক্ষুনি অমাত্য সত্যব্রতর সঙ্গে দেখা করতে চাইছেন।

"কী ব্যাপারে? উনি কি জানেন না আমরা কী ধরনের গোপন আলোচনায় ব্যাপৃত?" সেনাপতি বিশুদ্ধানন্দের রুষ্ট স্বরে ঝলসে উঠল ঘোর বিরক্তি। সেই স্বর উপেক্ষা করে ধীর স্বরে সম্রাটের দিকে তাকিয়ে অনুরোধ করলেন সত্যব্রত, "প্রভু, অনঙ্গদেবকে বিশেষ কাজে আমি গোপনে ডমরনগরে পাঠিয়েছিলাম। নিশ্চয়ই সে কোনো গুরুত্বপূর্ণ সংবাদ পেয়ে সবিশেষ উত্তেজিত, তাই অপেক্ষা না করে এখনই আমার কাছে এসেছেন। অনঙ্গদেবকে সভায় উপস্থিত হওয়ার অনুমতি দিন প্রভু।"

মুহূর্ত কয়েকের প্রতীক্ষামাত্র, আরক্তমুখে প্রবেশ করলেন অনঙ্গদেব, তাঁর সমস্ত শরীরে ফেটে পড়ছে বিপুল উত্তেজনায়। মহারাজকে অভিবাদন করে এক নিশ্বাসে বলে উঠলেন তিনি, "গুরুতর সংবাদ এনেছি প্রভু। আমরা আজ এক অভূতপূর্ব পরিস্থিতির সামনে দাঁড়িয়ে।" এই বলে সংবাদের পেটিকা খুলে বসলেন সেই প্রবীণ ও সুদক্ষ রাজকর্মচারী।

****

অনুচ্চ পাহাড়ের পাদদেশের জঙ্গলটির মধ্যে একাই ঘুরে বেড়াচ্ছিল ছেলেটি, জঙ্গলেই সে সবচেয়ে স্বচ্ছন্দ বোধ করে। শরতের মিঠে কিন্তু তীক্ষ্ণ রৌদ্রে চকচক করছিল তার সম্পূর্ণ কেশবিহীন মস্তক, নিকষ কৃষ্ণ নগ্নশরীরে পেশির ভাঁজে ভাঁজে জমে উঠছিল শিশিরের মতো স্বেদবিন্দু। একটা গাছের ডাল হাতে আনমনে এদিক-ওদিক দোলাতে দোলাতে হাঁটছিল সে। বোঝাই যায়, এই হাঁটার পেছনে লক্ষ্যে পৌঁছাবার কোনো তাড়া নেই, বরং উন্মনা স্বগত চিন্তার ভাবটি স্পষ্ট।

এই এলাকায় এখন কোনো লোক নেই, বা বলা ভালো

কোনো সমর্থ শরীরের পুরুষ নেই। সবাই এখন ডমরনগর বা তার আশেপাশের অঞ্চলে। কারণ কাল থেকে যুদ্ধ শুরু, মহাযুদ্ধ।

বাবা নামের লোকটা তাকে বলেছেন যে সে খুব ভালো যুদ্ধ করেছে। শত্রুদের নাকি নাকের জলে চোখের জলে একাকার করে দিয়েছে। তাই খবর এসেছে যে শত্রুরা সব লোকজন নিয়ে কালকে নাকি বাবাকে আর ওকে মারতে আসছে, কাল তাই দুই দলে লড়াই হবে, খুব লড়াই।

লড়াইয়ের কথা ভাবতেই শরীরটা চনমন করে উঠল তার। লড়াই করতে সে খুব ভালোবাসে, রক্ত দেখলে তার শরীরে আনন্দের মাতম লাগে। শত্রুর মাথা বিদীর্ণ করার মধ্যে যা সুখ, তার তুল্য শুধু বিন্ধ্যা ঠাকুরানির কাছে উৎসর্গীকৃত মহাভোজের স্বাদ। তাই কালকের জন্যে ও আর ওর সঙ্গীসাথিরা অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করে আছে। বাবা নামের লোকটা বলেছে ওদের ওপরেই নাকি নির্ভর করছে ওর দেশের লোকের ভবিষ্যৎ।

'ভবিষ্যৎ' শব্দটা মনে আসতেই ন্যাড়া মাথাটা একবার চুলকে নেয় সে। তার পক্ষে শব্দটা এমনিতেও খুব ভারী। তাদের যেমন অতীতও নেই, তেমন ভবিষ্যৎ বলতেও তারা কিছু বোঝে না। এমনকি তাদের সমাজে বেশি শব্দেরও প্রচলন নেই। আহার নিদ্রা মৈথুন হত্যা, এই সহজচক্রে তাদের জীবন চলে। গোষ্ঠীর সকলে একত্রে বাস করে, একসঙ্গে ভোজন করে, একসঙ্গে শয়ন। এই সহজ সরল সমাজে কারও নাম রাখার প্রচলন নেই। এই, ওই, তুই, সে, এই বলে যখন কাজ চালিয়ে নিতে পারছে লোকে, তখন একটা নাম রাখার প্রয়োজন কী?

সেই নামহীন আদিম সমাজে জন্মেও তার একটা নাম আছে, যা তার এই লোকটা তাকে দিয়েছিল। এই লোকটা

তাকে সত্যিই ভালোবাসে, তাই তার মা সেই নামটা গর্বভরে মনেও রেখেছে, মাঝে মাঝেই তাকে আদর করে সেই নামে ডাকে।

আহ, নামটা যেন কী? মনে আসি আসি করেও আসছে না। নিজের কেশহীন মাথাতেই কয়েকটা কঠোর মুষ্টাঘাত করে সে। নাম জিনিসটাই তাদের সমাজে বড়ো গোলমেলে জিনিস, তার ওপর এই নামের উচ্চারণটাও বড়ো ভজকট। মা বলেছে এই নামটাই তার সঙ্গে তার বাবার সমাজের যোগাযোগের একমাত্র উপায়।

তার সমাজ? কথাটা মনে হতেই একটা শিশংপা গাছের নীচে বসে পড়ে ছেলেটি। একটা কথা তার মাথায় আসছে কাল থেকেই... ভাবছে সেই কথাটাই সে...

কে তার সমাজ? কারা? এই যে তাদের আশেপাশের লোকজন, তারা যে তাদের মতো প্রায় উলঙ্গ নরমাংসভোজীদের অত্যন্ত ঘৃণা করে, সেইটা সে আর তার সঙ্গীরা বেশ বুঝতে পারে। শুধু ঘৃণা নয়, তার মধ্যে অনেকটা আতঙ্কও মিশে থাকে, সেটাও তার চোখ এড়ায়নি।

কাদের জন্যে মারছে সে? কাদের মারছে? কেন মারছে? যাদের মারছে তারা এমনিতেও তার কেউ নয়, তাদের সঙ্গে তার কোনো শত্রুতা নেই। আর যাদের হয়ে মারছে, তারাও কেবলমাত্র নামেই তাদের আপন করে নিয়েছে, ব্যবহারে রেখেছে অচ্ছুত করে। তাদের দীর্ঘ দেহের ছায়াদর্শনমাত্র এই নগরের লোকেরা আশঙ্কিত হয়ে পড়ে, মাঠেঘাটে খেলছে এমন শিশুদের ঘরে জোর করে ঢুকিয়ে দেয় এবং বাইরে থেকে দরজা-জানালা বন্ধ করে দিয়ে, বাড়ির সামনে দাঁড়িয়ে অতিসতর্কভাবে ঘাড় নুইয়ে হেঁ হেঁ করতে থাকে। তাদের দেহভঙ্গিতে সচরাচর এমন সতর্কতা দেখা যায় হিংস্র বুনো কুকুর বা ধূর্ত বন্য শিয়ালের সামনে। এরাও তার কেউ নয়।

তাহলে এখানে তারা এসেছে কেন? যে শত্রুতায় তাদের কোনো ভূমিকা নেই, যে আগুন তারা জ্বালায়নি, তাতে হবি আহুতি দেওয়ার দেওয়ার জন্যে তাদের কেন আসা?

কে জানে, তার মাথায় এতসব ঢোকে না। মা থাকলে হয়তো বুঝিয়ে দিত। মায়ের গায়ে যেমন শক্তি, বুকে তেমন সাহস, আর মাথায় তেমনই বুদ্ধি। মা থাকলে নিশ্চয় তার ন্যাড়া মাথায় হাত বুলিয়ে সব বুঝিয়ে দিত ঠিকঠাক... আদর করে ডেকে বলত...

কী যেন বলত? আহা, নিজের নামটা কিছুতেই মনে পড়ছে না তার... কী যেন নাম তার... তার মা যেন কী নামে ডাকে তাকে...

"কী বলছেন কী সম্রাট? ভীম আর হিমালয়কে হত্যা করতে গেলে এই মহাস্ত্রটি ছাড়া আমাদের হাতে আর উপায় আছে নাকি? একে হিমালয়ের মতন বিশালদেহী, যুদ্ধবিশারদ, জিতক্লম রণহস্তী এতদঞ্চলে আর একটিও নেই। হিমালয়ারূঢ় ভীমকে দেখায় যেন ঐরাবতপৃষ্ঠে স্বয়ং পুরন্দর! তার একপাশ রক্ষা করে কুমার শর্বদেব, ধনুকচালনায় গাণ্ডিবধন্বা ফাল্গুনির সমতুল্য সে। আর-এক পাশ রক্ষা করে ভীমের পোষ্যপুত্র মহাবল চণ্ডক, তার বাহন সেই ভীষণ বন্য মহিষে আরূঢ় হয়ে দুই হাতে দুই বিশাল খড়্গ ধারণ করে সে রণভূমে ঘুরে বেড়ায় কালান্তক কৃতান্তের ন্যায়। এদের মতোই কোনো মহারথীদের জন্যেই এত যত্নসাধনে সেই সুদূর চিনদেশ থেকে আনা ব্রহ্মাস্ত্রটি রক্ষিত, আর তাকে প্রয়োগ করতে হবে ওই জংলি বর্বরটির ওপর? এই মহাস্ত্র একটি মাত্র ছাড়া আর নেই প্রভু, আপনাকে এই নির্দেশ আরও একটিবার পর্যালোচনা করতে অনুরোধ করছি", কথাগুলো যথেষ্ট বিনয়ের সঙ্গে বললেও বিশুদ্ধানন্দের কণ্ঠস্বরের উষ্মা কিছুতেই গোপন করা গেল না।

কথাটা ফেলে দেওয়ার মতো নয়। আচার্য অতীশ যখন

সুদূর তিব্বতে সদ্ধর্মের প্রচারে নিরত ছিলেন, তখন তিনি চৈনিক দেশ থেকে আহৃত এই মহাস্ত্র দেখে মোহিত হন। তিনিই বহু কষ্টে ও বহুমূল্যে একটি বিশালাকার অস্ত্র ক্রয় করেন এবং বিশ্বাসী কিছু ছাত্রের হাত দিয়ে তৎকালীন সম্রাট ন্যায়পালের কাছে পাঠান।

মহাস্ত্রটি দেখতে বড়োই অদ্ভুত। একটি অতি দীর্ঘ ও দৃঢ় বংশদণ্ডের মাথায় কাষ্ঠনির্মিত বেলনাকার একটি দুইহাত পরিমিত বস্তু দৃঢ়ভাবে বদ্ধ। অত্যন্ত ভারী সেই বেলনটি থেকে নেমে এসেছে নাতিদীর্ঘ রজ্জু। অস্ত্রটি প্রয়োগের উপায় হচ্ছে, যেদিকে শত্রু অবস্থিত, সেদিকে বেলনটির সূচ্যাগ্রভাগটি নির্দেশ করে সেই রজ্জুতে অগ্নিসংযোগ করা।

তারপরেই নাকি বিশাল গর্জনে ঘোররবে সেই ব্রহ্মরাক্ষস ধেয়ে যায় শত্রুর প্রতি। তার জ্বালামুখ থেকে ক্রমশই উদ্‌গিরণ হতে থাকে কালভৈরবতুল্য ক্রোধবহ্নির। তারপর স্বর্গমর্ত্যপাতাল কম্পিত করে শত্রুর ওপর আছড়ে পড়ে সেই বজ্রতুল্য মারণাস্ত্রটি। যত বলশালী শত্রুই হোক না কেন, এই অব্যর্থ মৃত্যুর হাত থেকে কারও রেহাই নেই।

আর তাই কালকের নির্ণায়ক যুদ্ধে এর ওপর বড়ো বেশি আশা করে রেখেছিলেন বিশুদ্ধানন্দ। হিমালয়ারূঢ় ভীমকে একবার পতিত করতে পারলে কৈবর্তদের মনোবল ভেঙে যেতে বাধ্য। তদুপরি এই অমোঘাস্ত্রটির আরও কয়েকটি হুবহু নকল বানিয়ে রেখেছেন তিনি। একটি অস্ত্রের বিধ্বংসী মারণযজ্ঞ দেখেই ওরা ভীত হবেই, তারপর আরও এমন অস্ত্র দেখিয়ে ওদের আত্মসমর্পণে বাধ্য করাতে কতক্ষণ? এখন সম্রাট যদি আদেশ দেন সেই একটি মাত্র শত্রুঘাতী অস্ত্রকে কোনো এক জংলির ওপরে প্রয়োগ করতে, সেক্ষেত্রে সেনাপ্রধানের পক্ষে ক্ষুব্ধ হওয়া স্বাভাবিক।

"গুপ্তচর প্রধান অনঙ্গদেব সেদিন যা শোনালেন", গম্ভীর

স্বরে বললেন সম্রাট রামপাল, "তা যদি সত্যি হয়, তবে আকারে, প্রকারে, শক্তিতে আর নীতিহীন যুদ্ধের বীভৎসতায় ওই আরণ্যকদের সমকক্ষ কেউ নেই। ভীম অতি ধুরন্ধর পুরুষ, সে এইসব ভেবেই এই নিষাদবাহিনীকে আনিয়েছে। এদের এক এক জন দশজন সাধারণ সৈন্যের সমান। এমনিতেই এদের নিয়ে পালসৈন্য এবং সামন্তচক্রের সৈন্যদের মধ্যে বিচিত্র সব গুজব ছড়িয়েছে। এরা নাকি মায়াবী রাক্ষস, দশানন রাবণের বংশাবতংস, যমরাজের নিজস্ব বাহিনী ইত্যাদি ইত্যাদি। এদের ওই বিশালদেহী কেশহীন নেতাটিকে এই অস্ত্র ছাড়া হত্যার উপায় নেই। তাতে আমাদের সেনাদের মনোবল বিপুল পরিমাণে বৃদ্ধি পাবে, তা ছাড়া সংখ্যাধিক্যের জোর তো আমাদের আছেই।"

"কিন্তু প্রভু, সেক্ষেত্রে ভীমকে পরাস্ত করার তবে কী উপায়? যতক্ষণ ভীম আছে রণক্ষেত্রে, কৈবর্তসেনা জানে যে তাদের রাজা আছে। তাদের রাজার ডাকে তারা শেষ রক্তবিন্দু দিয়ে যুদ্ধ করতে রাজি..."

আরও কিছু বলতে যাচ্ছিলেন বিশুদ্ধানন্দ, বাধ সাধল ঘরের কোণে বসে থাকা তরুণ সভাকবিটি, সামান্য মেয়েলি সুরে সে বলে উঠল, "বৃথাই তর্ক করছেন সেনাপতি। সম্রাট স্বয়ং ঈশ্বরতুল্য, তাঁর অবিদিত তো কিছুই নেই। নিঃশঙ্ক হয়ে প্রভু রামের আজ্ঞা পালন করুন আপনি। অধর্মের বিরুদ্ধে প্রভু শ্রীরাম যখন তাঁর ধনুর্বাণ তুলেছেন, জানবেন যে ধর্মের জয় অবশ্যম্ভাবী।"

গনগনে চোখে সেদিকে তাকালেন বিশুদ্ধানন্দ। তাঁর বহুদিনের ইচ্ছে এই সখীভাবসম্পন্ন কবিবরের গণ্ডদেশে একটি বিশাল চপেটাঘাত করে এর কয়েকটি দন্ত উৎপাটিত করার। একে এই মেয়েলিপনা তাঁর বিন্দুমাত্র সহ্য হয় না, তারপর চাটুকারিতায় ছেলেটি প্রায় মহামহোপাধ্যায়! এর

জীবনের একমাত্র সাধনা বোধহয় সম্রাটের পদলেহন করে জীবন ধন্য করা। অমাত্যরা আড়ালে হাসাহাসি করেন, একদিন দৈবাৎ যদি সম্রাটের পদাঙ্গুলিতে সামান্য বিষ মিশিয়ে দেওয়া যায়, এই অপোগণ্ডটি সেইদিনই ভবলীলা সাঙ্গ করবে নিশ্চিত।

"আহ, তুমি আবার এ বিষয়ে কথা বলছ কেন?" প্রগাঢ় স্নেহমিশ্রিত স্বরে কবিবরকে মৃদু ধমক দেন সম্রাট, তারপর তাকান বিশুদ্ধানন্দের দিকে, "আপনার কি মনে হয়ে সেনাধ্যক্ষ, আমি এতই অর্বাচীন যে সে বিষয়ে ভাবনাচিন্তা না করেই আমি আপনাকে পরামর্শ দিচ্ছি সেই মহাস্ত্র জংলিদের ওপর প্রয়োগ করতে?"

খুবই অপ্রস্তুত হন সেনাপ্রধান, নম্র স্বরে বলেন, "না প্রভু, ঠিক তা নয়..."

"ভীমের জন্যে আমরা একটি বিশেষ ব্যবস্থা করেছি সেনাপতি। তা জানাতেই আপনাকে আমরা ডেকেছিলাম।"

"অধীন খুবই উৎসুক সেই ব্যবস্থা জানতে, প্রভু।"

"গুপ্তচরপ্রধান অনঙ্গদেব বহুকষ্টে দঙ্গদাস নামের এক কৈবর্তকে অর্থদ্বারা বশীভূত করতে সমর্থ হন। এই দঙ্গদাস আবার কৈবর্ত সেনামুখ্যদের মধ্যে এক অতি বিশিষ্টজনের অঙ্গসংবাহক। তার মাধ্যমে অতি সুকৌশলে আমরা সেই সেনামুখ্যের সঙ্গে সংযোগ স্থাপনে সমর্থ হই।"

বিশুদ্ধানন্দের মুখ দেখে বোঝা যাচ্ছিল যে তিনি শুনছেন না, প্রতিটি শব্দ তিনি শোষণ করছেন।

"অবশেষে প্রভূত আর্থিক উৎকোচ তথা অযুত ভূমিদানের প্রতিশ্রুতি দিয়ে তাকে আমরা দলে টানতে পেরেছি সেনাপতি।"

এই সময়ে সেই চাটুকার কবিবর বাষ্পাকুল কণ্ঠে প্রায় ককিয়ে উঠলেন, "জানতাম, আমি জানতাম যে প্রভু শ্রীরামের অসাধ্য কিছু নেই। জয় শ্রীরামের জয়..."

সেইদিকে বিন্দুমাত্র মনোযোগ দিলেন না বিশুদ্ধানন্দ, চাপা গলায় জিজ্ঞেস করলেন, "কে সেই সেনামুখ্য প্রভু?"

"মহাবল চণ্ডক।"

কথাটা হৃদয়ঙ্গম করতে কিছু সময় নিলেন সেই প্রৌঢ় সেনাপ্রধান। তারপর বুঝলেন যে এই চালের মার নেই। এবং খুব সম্ভবত এ ছাড়া ভীমকে হারাবার অন্য কোনো পথ নেই। চণ্ডক সর্বদাই ভীমের পাশে থাকে। ভীমের ওপর এই মারণাস্ত্র প্রয়োগ করলে তাতে চণ্ডকেরও আহত হওয়ার সম্ভাবনা, সম্রাট তাই সেটা চাইছেন না। ভীম পরাস্ত হলেই কৈবর্তসেনা ছত্রভঙ্গ হতে বেশি সময় নেবে না। শুধু রয়ে যাবে একটি মাত্র অপ্রতিরোধ্য বিরুদ্ধশক্তি।

ভীমের নিষাদপুত্র। ভীমের নিষাদসৈন্যদল।

"যান সেনাপতি, নিশ্চিন্ত চিত্তে সৈন্যসমাবেশ করুন। কালকে অফলার যুদ্ধাঙ্গনে পাল সাম্রাজ্যের বিজয় অবশ্যম্ভাবী। সংবাদটা যেন সূর্যাস্তের আলো থাকতে থাকতে পাই। ভীমকে জীবিত বন্দি করবেন, পারলে শর্বদেবকেও। আর হ্যাঁ, শুনুন, ভীমকে বন্দি করার পর একদল সৈন্যকে ডমরনগরের দিকে পাঠিয়ে দেবেন। আর তারপরেই কালবিলম্ব না করে এক ব্যক্তির মস্তকচ্ছেদন করে কর্তিত মস্তকটি আমার কাছে পাঠিয়ে দেবেন। দেখবেন, যেন দেরি না হয়।"

"কার মস্তক প্রভু? ভীমের?"

"না, চণ্ডকের।"

এই বলে সেই তরুণ কবিবরের দিকে ফেরেন পাল সাম্রাজ্যের সার্বভৌম সম্রাট রামপাল। মিষ্ট হেসে বলেন, "তারপর সন্ধ্যাকর, তোমার রামচরিত কতদূর এগোল?"

যুদ্ধক্ষেত্রের পাশে এক টিলার ওপর দাঁড়িয়ে পুরো যুদ্ধটা দেখছিল তারা। তারা বলতে একশো একজন। নিবাত নিষ্কম্প দীপশিখার মতো দাঁড়িয়ে ছিল তারা, সর্দারের ইঙ্গিতের

অপেক্ষায়।

ছেলেটি তখন নৈর্ব্যক্তিকভাবে যুদ্ধ দেখছিল। এত মারামারি কাটাকাটি দেখতে দেখতে হাই উঠছিল তার। একবার হাতের কৃপাণটিকে দেখে নিল, চমৎকার জিনিসই বানিয়েছে বাবা নামের লোকটার দেশের লোকজন। কেমন মুচুৎ করে মুণ্ডু কাটা যায়, তাদের মতো ধারালো পাথরের ছুরি দিয়ে কষ্ট করে কাটতে হয় না!

সকালে বাবা লোকটা তাকে ডেকেছিল, ডেকেছিল সেই নামে যেটা তার মা মনে রেখেছে। নামটা শুনে খুব ভালো লাগছিল তার, মায়ের কথা মনে পড়ে গেছিল কিনা! সে যাই হোক, লোকটা তাকে বলেছিল লোকটা যদি লাল রঙের কাপড় উড়িয়ে দেয়, তাহলে নেমে পড়তে। নইলে অপেক্ষা করতে।

তা অপেক্ষা করতে খারাপ লাগছিল না ছেলেটার। বাবা নামের লোকটা চড়েছে একটা হাতির ওপর। উরিব্বাবা, কী বড়ো সেই হাতিটা... বিন্ধ্যা ঠাকুরানির সামনে কম করে চারটে ভোজসভা হতে পারে ওর মাংসে। আর লড়তেও পারে বটে, যেমন হাতিটা, তেমন বাবাটা, দেখে খুব ভালো লাগছিল তার। এইজন্যেই মা বলেছে ওকে, যে ওর বাবাটাও খুব বীর।

কিন্তু ধীরে ধীরে যুদ্ধের গতিপ্রকৃতি বদলাচ্ছিল। কমপক্ষে পঞ্চদশ সামন্তপ্রভুর সৈন্যবলে বলীয়ান পাল সৈন্যবাহিনী। তদুপরি তাদের হাতে অগণিত অশ্বারোহী সেনা, তারা মুহূর্তে ছিন্নবিচ্ছিন্ন করে ফেলছিল কৈবর্তসেনাদের যাবতীয় প্রতিরোধ। পূর্বদিকে দণ্ডভুক্তিরাজ জয়সিংহ আর বাল-বলভীর অধিপতি বিক্রমরাজ অধিষ্ঠিত ছিলেন, পশ্চিমদিক রক্ষা করছিলেন কূজবটীসম্রাট শূরপাল এবং নিদ্রাবলীর বিজয়রাজ। দক্ষিণপথ রোধ করে ছিলেন কৌশাম্বীনরেশ দ্বোরপবর্ধন ও সংকটগ্রামের রাজা চণ্ডার্জুন।

যদিও আক্রমণের আধিক্য ছিল উত্তর দিক থেকেই।

পাল সেনাধিপতি বিশুদ্ধানন্দ, মগধরাজ ভীমযশ, ঢেক্করীরাজ প্রতাপসিংহ এবং উচ্ছলাধিপতি ভাস্করবর্মণ, এই চার অতিরথ মিলে ব্যতিব্যস্ত করে তুলছিলেন কৈবর্তসৈন্যদের।

দেখতে দেখতে রক্ত গরম হয়ে উঠছিল ছেলেটির। ইস্, বাবা নামের লোকটা এখনও লাল রঙের কাপড় ওড়াচ্ছে না কেন? তার দলের ছেলেরাও রক্ত দেখে অধীর হয়ে উঠেছে। নামতে চায়, তারা এক্ষুনি নামতে চায় রণভূমিতে।

ওই তো, ওই তো দেখা যায় লাল ধ্বজা...

সবে বিজয়ের গন্ধ পেতে শুরু করেছিল পালসৈন্যদল। যেমন রক্তের গন্ধ পেয়ে আরও হিংস্র হয়ে ওঠে বন্য কুকুরের দল, তেমনই বিপুল উদ্যমে তারা সংহার করতে শুরু করেছিল দাঁতে দাঁত চিপে লড়ে যাওয়া কৈবর্তসেনাদের। মাত্র আর কয়েক দণ্ডের অপেক্ষা, তারপরেই ডমরনগর তাদের। যেভাবে সুগন্ধি পলান্নের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে ক্ষুধার্ত ভিক্ষুকের দল, লুব্ধ পালসৈন্য সেভাবেই ঝাঁপিয়ে পড়বে কৈবর্তরাজধানীর ওপর, লুঠ হয়ে যাবে কৈবর্তদের সম্পদ, সোনাদানা আর ফসল। লুঠ হয়ে যাবে কৈবর্ত নারীরা, তাদের সম্মান তাদের ছিন্নবস্ত্রের মতোই লুটিয়ে পড়ে থাকবে ডমরনগরের রাজপথে।

লুঠ হয়ে যাবে বাংলার বুকে জ্বলে থাকা একমাত্র স্পর্ধিত স্বাধীন দীপশিখাটি!

জয় আর বেশি দূরে নয়, এমন সময় সবিস্ময়ে পালসৈন্যরা দেখলো যে কুলু কুলু ধ্বনিসহ ঘোররবে তাদের সৈন্যসমুদ্রের মধ্যে দাবানলের গলিত আগুনের মতো নেমে এল উন্মুক্ত কৃপাণহস্তে বিশালদেহী, ভয়ংকররূপী কালান্তক নিষাদসৈন্যদল। পালসেনাদের মধ্যে এই অদ্ভুতকর্মা নিষাদযোদ্ধাদের নিয়ে বিচিত্র সব নারকীয় কাহিনি পল্লবিত হয়ে ছড়িয়ে পড়েছে ইতিমধ্যেই। ফলে মুহূর্তের মধ্যে থমকে দাঁড়াল তারা, আর এই ভয়ানক অসম যুদ্ধের গতিপ্রকৃতি

বদলে যেত থাকল এই প্রথম বার।

ভীমের নিষাদপুত্রটি ভীমনাদে যুদ্ধক্ষেত্রে নেমে এসে প্রথমে যে যোদ্ধাকে পেল হাতের কাছে, বাম হাত দিয়ে তার কেশাকর্ষণ করে মুখ নামিয়ে আনল তার কণ্ঠনালী বরাবর। তারপর দাঁত দিয়ে তার গলার অর্ধেকটা কামড়ে তুলে নিয়ে থু থু করে ফেলে দিল একপাশে। তারপর এক বীভৎস রণহুংকারে কম্পিত করে তুলল আকাশবাতাস।

ব্যাস, এইটুকুরই প্রয়োজন ছিল। যেভাবে দুরন্ত বালক লাঠি দিয়ে সারমেয়শাবকদের তাড়িয়ে নিয়ে যায়, সেভাবেই মাত্র এই একশোজন নিষাদযোদ্ধা পালসৈন্যদের তাড়িয়ে নিয়ে যেতে লাগল। যেন বাজপাখি নেমে এসেছে পায়রাদের মধ্যে, সেইভাবে পালাতে লাগল পালসৈন্যরা।

নতুন উদ্যমে কৈবর্তসেনা যুদ্ধ করে শুরু করে দিল। শর্বদেবের মধ্যে যেন ভর করে এলেন ক্ষত্রিয়হন্তা পরশুরাম স্বয়ং। বরেন্দ্রীসূর্য ভীমের ইঙ্গিতে তাঁর রণহস্তী হিমালয় ঘোর বৃংহণে রণভূমি প্রকম্পিত করে আবার রণপ্রমত্ত হয়ে উঠল। ঘোররবে জমে উঠল অফলার সেই যুদ্ধক্ষেত্র, চিরস্বাধীনতার স্বাদ পেয়ে উজ্জীবিত হয়ে উঠল কৈবর্তসৈন্য।

পাল সেনাধ্যক্ষ ও সামন্তচক্রাধিপতিদের সঙ্গে আশঙ্কিত হয়ে উঠলেন আরও একজন। বিপুল ঐশ্বর্যের হাতছানি যে মিথ্যে হয়ে যায়!

ছুটছিল হিমালয়, মেদিনী প্রকম্পিত করে। পাশে ছুটছিল একটি রণদুর্মদ বন্যমহিষও। অকস্মাৎ সেই মহিষের আরোহী বিপুলদেহী সেনানীটি তার ভল্লের অগ্রভাগ ঢুকিয়ে দিল হিমালয়ের চোখে। মুহূর্তে আর্তনাদ করে উঠল সেই সুশিক্ষিত গজরাজ। মাহুতের নির্দেশিত দিক ভুলে ছুটতে লাগল যেদিকে পালসৈন্য তার জন্যে পরিখা খুঁড়ে রেখেছে, সেই দিকে।

শর্বদেব ব্যাপারটা দেখলেন এবং অসহ্য ক্রোধে ধাবিত

হলেন সেইদিকে। বিশ্বাসহন্তা এই চণ্ডককে শাস্তি দেওয়া প্রয়োজন বটে, কিন্তু তার আগে পিতাকে এই সংকট থেকে উদ্ধার করা আশু কর্তব্য।

সমস্ত দৃশ্যটা কৌতুকমিশ্রিত নৈর্ব্যক্তিকতাসহ দেখলেন বিশুদ্ধানন্দ। তারপর বিশ্বস্ততম রথী শার্ঙ্গপাণিকে বললেন, "সময় উপস্থিত হে বীর, মহাস্ত্র প্রস্তুত করো।"

বংশদণ্ডনির্মিত অস্ত্রপীঠ প্রস্তুত ছিলই, শার্ঙ্গপাণির অনুচরেরা অতি কষ্টে সেই ব্রহ্মাস্ত্র সেখানে স্থাপন করে, পরিখার দিকে ধাবিত হিমালয়ের দিকে তার মুখ ফেরাতেই বাধা দিলেন বিশুদ্ধানন্দ, "উঁহু, ওদিকে না, ওইই দিকে।"

"কার দিকে অধিপতি? ওই কেশহীন নিষাদটির দিকে?"

"হ্যাঁ।"

শার্ঙ্গপাণি অবাক হলেন বটে, কিন্তু প্রশ্ন করা তাঁর ধাতে নেই। তিনি আদেশ পালন করেই অভ্যস্ত। তিনি তাই করলেন, যা বিশুদ্ধানন্দ বলেছেন।

"অতঃপর, প্রভু?"

"অগ্নিসংযোগ করো শার্ঙ্গপাণি।"

ঘোররবে যুদ্ধ করছিল ছেলেটি। রক্তের এই খেলা তার মধ্যে বিপুল আনন্দ জাগিয়ে তুলছিল। পলায়নপর, ভীত সৈন্যদের ধরে ধরে তাদের হত্যা করার মধ্যেও একটা অসম্ভব উল্লাস আছে, সেটা আর অস্বীকার করতে পারছিল না সে।

এমন সময় এক অজানা শোঁ শোঁ শব্দ শুনে অবাক হয় সে আর ফিরে দাঁড়ায় শব্দের উৎসমুখটির দিকে। আর বিপুল বিস্ময়ে হতবাক হয়ে যায়। অবাক হয়ে সে ভাবে, এ আবার কী? কই, তার মা অথবা বাবা নামের লোকটা এই নিয়ে কিছু তো বলে দেয়নি।

সে দেখে যে তার দিকে উল্কার বেগে ধাবমান এক

অগ্নিপিণ্ড। তবে কোনো বিভ্রান্তি নয়, তাকে যা আচ্ছন্ন করে ফেলে তা হচ্ছে তার দিকেই ধাবিত সেই মৃত্যুপিণ্ডটির মোহিনী মায়া। আহা, এত রাজসিক, এত গরীয়ান, এত মহিমান্বিতও হতে পারে কারও মৃত্যু?

ফিরে দাঁড়ায় ছেলেটি, তার পাথুরে বুক নিয়ে ফিরে দাঁড়ায় তার অব্যর্থ মৃত্যুর সামনে।

খুব কাছে এসে পড়েছে দাবানলটা, আর এড়াবার উপায় নেই, এই কথাই ভাবে সে। যদিও তাতে তার কোনো খেদ ছিল না। শুধু ইচ্ছে ছিল তার মাকে একবার দেখার, আর একটা কথা জিজ্ঞেস করার।

যে যুদ্ধে তাদের কোনো ভূমিকাই নেই, সেখানে তাদের বিন্ধ্যাদেবীর বলি হতে পাঠানো কেন? যে আগুনের ওপর তাদের কোনো দাবি নেই, সেই আগুনে তাদের পতঙ্গের মতো পুড়তে পাঠানো কেন?

আগুনটা খুব কাছে এসে পড়েছে। তার একবার মনে হল একমাত্র মা-ই বোধহয় এই প্রশ্নের উত্তর দিতে পারত। তার মাথায় হাত বুলিয়ে নাম ধরে ডেকে বলত...

আহ্, কী নামে যেন তাকে ডাকতে তার মা? বাবা নামের লোকটা আজ আজ সকালে তাকে যেন কী নামে ডেকেছিলে? কিছুতেই মনে পড়ে না তার... কী যেন... কী যেন... কী যেন...

আগুনের গোলাটা তার চওড়া বুকে আছড়ে পড়ার ঠিক আগের মুহূর্তে অলৌকিকভাবে তার মনে পড়ে যায় নামটা। কোনো অপার্থিব স্বর যেন তার চৈতন্যের মধ্যে জাগিয়ে তোলে আজন্মের স্নেহস্মৃতি। চকিতের মধ্যে মনে পড়ে যায় মা কী নামে ডাকে তাকে... বাবা নামের লোকটা আজ সকালে তাকে কী নামে ডেকেছিল।

মৃত্যুর ঠিক পূর্বমুহূর্তে তার মনে পড়ে যায় যে মা তাকে আদর করে ডাকত ঘোটু বলে। বাবার দেওয়া নামটাই ছোটো আর আদুরে করে নাম রেখেছিল মা, ঘোটু।

আর সেই বাবা নামের লোকটা কী নাম দিয়েছিল তার?

ঘটোৎকচ! কৈবর্তনৃপতি ভীম তাঁর নিষাদপুত্রের নাম রেখেছিলেন ঘটোৎকচ!



boiChoi publiCation

think books, think boiChoi

ISBN 978-93-93949-08-0

9 789393 949080